শান্তির বিয়ে

পিতুরোপ্যাধিকা মাতা গর্ভধারণাৎ পোষণাৎ।
অত্রহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমগুরুঃ

সেই মায়ের চরণে
এই আমার সশ্রদ্ধ অঞ্জলী
ইতি—লেখক

শ্রী বিশ্বনাথ মজুমদার

প্রকাশক—শ্রীদেবাশীষ মজুমদার
পরিবেশক—ব্যাগ্‌স এণ্ড কো
C/o নিউ ভারতী প্রেস
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া—১৩৫৭
মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র

মুদ্রাকর:—
রামকৃষ্ণ সরকার
নিউ ভারতী প্রেস
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬।

LIFE LINE

A Periodical Devoted to the interests of Railwaymen. Vol. IV. Calcutta, 31st March 1951. No. 16.

Public Relation Office. Calcutta.

"We have read with interest and joy three books in Bengali presented to us by Sri Biswanath Mazumder. The books "ASHAYA BANDEYA GHAR", (আশায় বাঁধে ঘর) "MANASH PRATIMA" (মানস প্রতিমা) and "SANTIR BIYEA" (শান্তির বিয়ে) unmistakably reveal the literary talents of the author, and we hope to see still better works to come out from his pen in future.

The first two books as the names Suggest (আশায় বাঁধে ঘর, মানস প্রতিমা) have ended in tragedy and Comedy respectively and the turn of events so nicely delineated make them worth reading. We Commend the books Specially to the Railwaymen."

"যোগাযোগ" বলেন ঃ—

৩১শে মার্চ্চ ১৯৫১

"আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার একে একে তিনখানি নূতন বই লিখিয়াছেন।

উঁহাদের নাম যথাক্রমে—

আশায় বাঁধে ঘর

মানস প্রতিমা

ও

শান্তির বিয়ে

বই তিনখানি পড়িয়া মোটামুটিভাবে আমাদের ভালই লাগিল। নূতন লেখক হিসাবে বিশ্বনাথবাবু যে সাহিত্যিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। আমরা আশাকরি উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারিলে শ্রীযুক্ত মজুমদারের প্রতিভা আরও বিকশিত হইবে এবং তিনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার সাহিত্য-জীবনে আমরা সাফল্য কামনা করিতেছি।"

উপহার

শান্তির বিয়ে

"তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে। কেন জানিনা—তোমার নাম ধরে' হাজার বার ডেকেও আমার যেন আশা মেটে না। ও নামে যেন কত শান্তি, কত স্বস্তির জড়িমা মাখানো! তাই—সত্যি কথা বল্‌তে কি সুশীল—" বৃদ্ধ মিঃ গুপ্ত আর বল্‌তে পারেন না। চোখ দু'টো তাঁর জলে ভরে আসে। গড়িয়ে পড়া চোখের জলে কোঁচাব শুক্‌নো খুঁটটা সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন এই সুশীল। বাঙ্গলা মায়ের কাঙ্গাল ছেলে আমাদের সুশীল—বেকার সমস্যার সমাধানার্থে প্রবাসী আজ সে—বয়েস মাত্র বাইশ কি তেইশ। কর্ম্মক্ষেত্রের একই কার্য্যালয়ে এই বৃদ্ধ ও যুবক দুইটীর মধ্যে একজন একজনের সান্ত্বনা প্রার্থী ও দাতৃ।

সুশীল ভাবে—তার এই তিন অক্ষরে নামটার মধ্যে এমন কি গুপ্ত রহস্য থাকতে পারে যা'র আকর্ষণে বৃদ্ধের চোখে আসে জল—অন্তরে আসে শান্তির পরিপূর্ণতা। যাকে দেখে

বৃদ্ধের প্রাণে বইতে থাকে আনন্দ হিল্লোল—মুখে ফুটে ওঠে তা' প্রকাশ করবার প্রবল ব্যাকুলতা। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত সুশীল তার সবটুকু চিন্তাশক্তি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান ক'রবার চেষ্টা করেছে,—কিন্তু সে চেষ্টা তা'র ফলবতী হয় নি। কখনও সে ভেবেছে গুপ্ত মশাইয়ের মৃতপুত্র সুনীলের ছবিখানির হয়ত'বা সে নিজেই একটা প্রতিচ্ছবি—হয়ত'বা তার কণ্ঠস্বরে মিঃ গুপ্তের মনের মাঝে বেজে চলে আজও ভু'লতে না পারা—আজও মিলিয়ে না যাওয়া তাঁর পুত্রের মুখের কথার সুরে ফুটে ওঠা—বীণার তারে ঝঙ্কার পাওয়া সুরের যত লহরীগুলো।

কিন্তু—

কিন্তু কেন? এও ত' হ'তে পারে—এ পক্ষের মেয়ে শান্তির সঙ্গে তা'র—না না তা' যদি হ'ত তাহ'লে মিঃ গুপ্ত একথা বলবেন কেন যে তাঁর সুশীলকে এত ভাল লাগা, তা'কে তা'র নাম ধ'রে ডেকে মনের মাঝে এতখানি শান্তি পাওয়ার পিছনে নেইকো কোন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির অনুপ্রেরণা।

ক'দিন হ'ল মিসেস্ গুপ্তা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। সামান্য বেতন-ভোগী মিঃ গুপ্তের হাজার চেষ্টাকে বিফল ক'রে রোগ ক্রমশঃ বিপথগামী হ'তে লা'গল। তাই হয়ত' বা কর্ত্তব্যের খাতিরেই সুশীল সেদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির হ'ল মিঃ গুপ্তের কোয়ার্টারে। রোগীর পাশে ব'সতেই তা'র মনে পড়ে গেল

অতীতের এক কাহিনী। এ স্মৃতি তা'র হৃদয়ের পরতে পরতে জাগাল এক অসহ্য বেদনা ভরা আঘাত। তার মা'ই ছিলেন তার জীবনের সব কিছু—যাঁকে হারিয়ে আজ সে হয়েছে সব দিক দিয়ে অতি নিঃস্ব।

রোগের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষতঃ মুখে তাঁর ফুটে উঠেছে দারুণ পরাজয়ের চিহ্নগুলো। তা' দেখে সুশীলের মনের মাঝে ব্যথা জাগে—মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত মনটা হাহাকারে ওঠে ভ'রে। তাই সে—হয়ত' বা একান্ত আনমনেই চালিয়ে দেয় তার আঙ্গুলগুলো রোগীর রুক্ষ কেশের মাঝ দিয়ে।

"এখন কেমন আছেন কাকীমা?" উত্তরের আশে প্রশ্ন করে সুশীল।

"ভাল নয়। তুমিই কি সুশীল? তোমার কথা তোমার কাকাবাবুর মুখে প্রায়ই শুনেছি। এতদিন তুমি আমাদের বাড়ী আসনি কেন বাবা?" ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দেন মিসেস্ গুপ্তা।

কোন্ প্রশ্নের উত্তরটা আগে দেবে তা' ঠিক ক'রতে পারে না সুশীল। তাই সে শুধু রোগীর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানার ওপর দৃষ্টি রেখে চুপটি ক'রে থাকে ব'সে।

মিসেস্ গুপ্তা সুশীলের ডান হাতখানা চেপে ধ'রে কি যেন কি বল্‌তে চাইলেন। কিন্তু কেন না জানি—সে ভাষা তাঁর পেল না মুক্তি। বিনিময়ে—মুখে তাঁর ফুটে উঠ্‌ল

তৃপ্তি-বিজড়িত এক টুকরো ম্লান হাসি। এ হাসির অর্থটা সুশীলের কাছে উহ্যই রয়ে' গেল—প্রকাশ পেল না।

রাতের আঁধার ক্রমশঃ জমাট বেঁধে এল। তাই সেদিনের মত বিদায় নিতে সুশীল দাঁড়ায় উঠে—কাকীমা বলেন, "কাল আবার এস বাবা।"

সুশীলের আসা যাওয়ার মাঝে দু'পক্ষেরই জড়তা যায় অনেকটা কেটে। বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে শান্তি। তাই পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে দস্তুর মত সুরু হয়ে যায় ওদেরকে কেন্দ্র করে গোপন যত কাণাকাণি। ব্যাপারটা ক্রমশঃ সুশীলের কাণেও পৌঁছুল।

একদিন দু'দিন ক'রে কয়েক দিন কেটে গেছে সুশীল ওবাড়ীতে আর যায় নি। মিঃ গুপ্তের অনুরোধের আর অন্ত নেই—"তোমার কাকীমা তোমায় ডেকেছেন, তাঁকে একবার দেখ্‌তে যেও সুশীল।" সুশীল বলে, "যাব কাকাবাবু"—কিন্তু ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় কে জানে—যাওয়া তার হয়ে ওঠে না মোটেই। এমনি ভাবে দিনের পর মাসও যায় কেটে।

"কি আশ্চর্য্য বলত সুশীল! তুমি যেদিন তোমার কাকীমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে এলে, ঠিক সেই দিন থেকেই তোমার কাকীমার রোগ ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে আসতে লা'গল। তা'র আগে ডাক্তারের শত চেষ্টা, আমার হাজার যত্ন—এমন কি শান্তির অক্লান্ত সেবাও কিছু করতে পারে নি। না না, তুমি তাচ্ছিল্যের হাসি হেস না—এ হাসির

কথা নয়। নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার—না আজ আর তোমায় ছাড়ছি না। চল—তোমাকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাই তোমার কাকীমার কাছে।”

সুশীল অনেক আপত্তি জানাল—কত অহেতুক অনুনয়-বিনয় প্রকাশও ক'রল সে। কিন্তু বৃদ্ধ ছাড়বার পাত্র নন্। তাই প্রায় এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়ীতে।

কাকীমা মহাখুসী। তাই তিরস্কারের স্বরে অনুযোগ মিশিয়ে বলেন, “রোগের মধ্যে কতবার তোমায় দেখতে চেয়েছি সুশীল—কতবার তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি বাবা, কিন্তু তুমি আসনি। মনে কর আমি যদি সেরে না উঠতুম, যদি মরেই যেতুম, তা'হলে আমার জন্যে তোমার প্রাণ হয়ত কাঁদ'ত না। কিন্তু আমি মরেও বোধ হয় তোমায় ভুল্‌তে পারতুম্ না। তোমাকে দেখবার মৃত্যু-কালীন প্রবল আকাঙ্ক্ষায় হয়ত' বা আবার আমাকে জন্মাতেই হ'ত এমনি একটা সংসারে—তোমাদেরই সন্নিকটে।” কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে কাকীমার চোখ দুটো জলে ভরে এল—গলাটা কেঁপে উঠল। তাই একটু থেমে আঁচলের খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিয়ে হঠাৎ সুশীলের ডান হাতখানা চেপে ধরে' আবার সুরু করেন, “না বাবা! কথা তোমাকে দিতেই হ'বে—রোজ একবার ক'রে আমাকে দেখতে তোমায় আসতেই হ'বে। বল—আসবে তো?”

“আ'সব। কিন্তু আমাকে যে আস্‌তেই হ'বে, তার এত জরুরী কারণটা কি কাকীমা?”

কাকীমা চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে সানন্দে বলে ওঠেন, "থাক্ থাক্। আর কিছু চাই না। তোমার মুখের কথাই হ'ল আমার হাজার আকাঙ্ক্ষার লক্ষ আশা। কিন্তু বাবা। একটা কথা তোমায় আমি বলে রাখি। যদিও টাকা-পয়সাই এ দুনিয়ার সব। টাকা-পয়সা সব সময়ে মানুষের কাছে থাকে না। তাই মানুষ হাজার চেষ্টাতেও সব সময়ে ওই সংক্রান্ত ব্যাপারে কথার ঠিক রাখ্‌তে পারে না। কিন্তু মুখের কথা—যেখানে অর্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—সেই কথাটা ঠিক্ রাখ্‌বার চেষ্টা তুমি করো। জীবনে সত্যটাই সব চেয়ে বড় জিনিষ। সেই সত্যকে কখন পরিত্যাগ কোরো না। যা' বল্‌বে—তা' কর্‌বেই।"

"কিন্তু কাকীমা! ওই "বলা" আর "করার" মাঝেই যে রয়েছে যত হাজার সমস্যা! তা যদি না থা'কত, তা'হলে মানুষ যা বলত, তা কর্‌তে নিশ্চয়ই হ'ত সক্ষম। ও দুটোর মধ্যে অতখানি ব্যবধান যদি না থা'কত, তাহলে মিথ্যেকে ঠকিয়ে দিয়ে জগত মাঝে নিজের ওজনটুকু দেখিয়ে দিতে সত্যত' কোনদিনই পারত না এতখানি মাথা তুলে দাঁড়াতে।"

কাকীমা সুশীলের মাথাটা নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরে একটু হেসে বলেন, "পাগল ছেলে! জানি তুই আজকাল একটু আধটু লিখতে শিখেছিস। হয়ত' বা একদিন বড় একজন লেখকের মত তোর নামটাও প'ড়বে ছড়িয়ে দেশ হ'তে দেশান্তরে। কিন্তু তাই বলে—"

সুশীল হঠাৎ নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাকীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মহানন্দে বলতে থাকে—"তুমি সেই আশীর্ব্বাদই আমায় কর কাকিমা, আমি যেন বড় বড় লেখকদের পায়ের ধূলো হয়েই সারা দেশটায় ছড়িয়ে পড়ি। টাকা চাই না, পয়সা চাই না, সুখ চাই না, শান্তি চাই না। আমি চাই দেশ জোড়া নাম। ধনী নয়—নির্ধনী নয়, উপাস্য নয়, উপাসক নয়, হ'তে চাই শুধু একটি লেখক।" তারপর কি যেন কি খানিক ভেবে নিতান্ত ছেলেমানুষেরই মত বলে বসে "আচ্ছা কাকীমা! ভগবানের আশীর্ব্বাদে—তোমার শুভেচ্ছায় সত্যিই আমি যদি তাই হই—তাহলে তুমি আমার লেখা বই পড়বে ত'?"

কথার মাঝে আঘাত হেনে দরজার পাশে কে যেন খিল্‌খিলিয়ে ওঠে হেসে।

হাসির শব্দে সুশীল নিজেকে সংযত করে নেয়। মনে ভাবে, "ছি—ছি—ছি! এ তার কি ছেলেমানুষী! এ চিন্তা, এ আকাঙ্ক্ষা বুঝিবা তার আকাশকুসুম। বুঝিবা এ একেবারেই অসম্ভব—বুঝিবা তার এ চিন্তা একেবারেই হাস্যকর! ওই শান্তি, হাজার হোক্ মেয়েমানুষ—যাদের নিয়ে আর আর লেখকদের মত সেও করে খেলা, শিশুর হাতে কাঠের পুতুলটারই মত—নানান কল্পনার বেড়াজালে ঘেরা তার যত গল্পবাজীর মাঝে, তারই হাতের কৌশলে শান্তির মত মেয়েদের বাঁচা-মরা, চলা-ফেরার ভঙ্গিটুকুর

মাপকাঠির পরিমাণ নিরূপণ করাই যার জীবনের যতেক কিছু কেরামতি। এ হেন সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে এ হাসির অর্থ কি! একি তবে বিদ্রূপ!"

"কে শান্তি বুঝি? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আয়—এখানে এসে ব'স।" কাকীমা প্রায় একরকম জোর করেই শান্তিকে টেনে এনে পাশে বসাল।

"আচ্ছা কাকীমা আজ তা'হলে আসি।" সুশীল উঠে দাঁড়ায়—শান্তির সাথে হয় দৃষ্টি বিনিময়। তা' দেখে মিসেস্ গুপ্তা তাড়াতাড়ি সুশীলকে বসিয়ে দিয়ে বলেন, "একটু বোস সুশীল আমি ততক্ষণ চট্ করে এক কাপ্ চা তৈরী করে নিয়ে আসি।"

"না না আপনি আর এই রোগা শরীর নিয়ে—"

সুশীলকে বাধা দিয়ে শান্তি জবাব দেয়, "মা এই রোগা শরীর নিয়ে সংসারের অনেক কাজই ক'রে থাকেন। সুতরাং আপনার জন্যে একটু চা তৈরী ক'রতে গেলে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা—"

"বিশেষ না হ'ক একটুও তো—আচ্ছা আপনারই বা কি আক্কেল বলুন ত'? মা'কে না পাঠিয়ে আপনি নিজেও ত' এ কাজটা ক'রতে পারতেন।"

"মাপ করবেন লেখকমশাই! আমার হাতে তৈরী চা খাবার এতখানি আগ্রহ আপনার—তা' আমার আগে জানা ছিল না।"

"শ্রীমতী শান্তি দেবী দেখছি অন্তর-দূরদর্শিতায় বিশেষ

পারদশী! আমার মনে হয় ও বিষয়ে আর একটু বেশী দক্ষতা থা'কলে আপনি সত্যি সত্যিই দেবী হ'তে পা'রতেন।"

"সে দক্ষতা যখন আমার নেই, তখন বাধ্য হয়ে দেবেরই শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। সুতরাং—দেব! আমাকে ওই ক্ষমতাটুকু দান করে আপনি নিজে ধন্য হউন।"—শান্তি অভিনয় ভঙ্গিতে ···গলায় আঁচল দিয়ে করজোড়ে সুশীলের সামনে দাঁড়ায়। তর্দ্দশনে সুশীল বলে, "এ আবার আপনার কি অভিনয় শান্তি দেবী ?"

"আপনার নয়—বলুন তোমার।"

"আচ্ছা তাই না হয় হল। কিন্তু—কেন বলুন ত' শান্তি দেবী ?"

"দেবী নয়—শুধু শান্তি। তাছাড়া, সব "কেনর" উত্তর নেই। মনে করুন লেখক মশাই! আমি আপনাকে প্রশ্ন করলুম, আমি স্ত্রী আর আপনি পুরুষ—এদুটো একজাত নয় কেন ? পারেন আপনি এই "কেনর" উত্তর ঠিক্‌মত দিতে ?"

"না।"

"তবে ?"

"তোমরা ছ'জনে বুঝি তর্ক বাধিয়েছ ? আচ্ছা তর্ক তোমাদের পরে ক'রলেও চ'লবে অখন—এখন এই চাটুকু খেয়ে নাও দেখি।"—মিসেস্ গুপ্তা সুশীলের হাতে চায়ের পেয়ালাটা তুলে দেন। সুশীল চা পান ক'রতে থাকে। মিসেস্ গুপ্তা অপলকদৃষ্টে থাকেন চেয়ে নিটোল তার মুখখানার দিকে।

"ছি। শান্তি! এ তুমি কি ক'রছ! তোমার আমার এ রকম মেলামেশা—এতে তোমার বাপ-মা'ইবা কি মনে করবেন বলত'? তা'ছাড়া—আমাদের দু'জনের ভবিষ্যৎ যখন এক কিনা এখনও জানা যায় নি—সে বিষয়ে সন্দেহ যখন অনেক, তখন এতখানি ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমি ভাল মনে করি না। তা'ছাড়া, এ জিনিষটাকে আমি বেশ পছন্দও করি না।"

"কেন লেখক—আমাদের ভবিষ্যৎ এক নয় কেন? তুমিত' বহুবার বলেছ' তুমি আমাকে বিয়ে ক'রবে। তবে আজ আবার এ কথা বলছ কেন?"

"আমার ত' তোমাকে বিয়ে ক'রবার ইচ্ছা নেই বলছি না শান্তি। কিন্তু এ কথাও তো তোমাদের বহুবার বলেছি যে, আমার সম্বন্ধে সমস্তটাই নির্ভর ক'রছে আমার দাদুর মতামতের ওপর। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'রবার এতটুকুও শক্তি যে আমার নেই, এ কথাত' বহুবারই আমার মুখে তোমরা শুনেছ শান্তি।"

"তোমার দাদুর মতামত ত' পাওয়া গেছে লেখক?"

"পাওয়া গেছে সত্য—কিন্তু তাঁর দাবী পূরণ সম্বন্ধে ত' তোমরা একেবারেই নির্ব্বাক। সেদিকটার আকাশ যতদিন পরিস্কার না হচ্ছে, ততদিন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।"

"আমার বাবা ত' লিখেছেন, তোমার দাদু যা' যা' চান্, তা' সবই তিনি দেবেন?"

"হ্যাঁ লিখেছেন। কিন্তু আমার দাদু কি কি চান্—আর

তোমার বাবা কি কি দেবেন, কই তাত' তিনি পত্রে কিছুতেই লিখতে চাইছেন না ?"

"আমাদের ওপর তোমাদের কি এটুকু বিশ্বাসও নেই লেখক ? তা'ছাড়া, তোমার আমার সম্বন্ধ বজায় রাখতে যদি রেজেষ্টারীর আশ্রয় নিতে হয়—তা'হলে ত' বুঝতে হ'বে আমাদের কোন আত্মমর্য্যাদাই নেই।"

"আমার যতদূর জানা আছে, আমাদের এই বিয়ের আদান-প্রদান সম্বন্ধে সামান্য পত্রে উল্লেখ করা ছাড়া অন্ততঃ আমাদের তরফ থেকে রেজেষ্টারীর কথা কিছুই ওঠেনি। তবে ভবিষ্যতে যদিও ওঠে, তাহলে বু'ঝব যে, সে প্রস্তাবটারও প্রয়োজন হয়েছিল। তা' যদি না হবে—তা'হলে তোমার বাবাই বা কেন সোজাপথে চলছেন না শান্তি ?"

"তুমিত' জান লেখক আমরা কত গরীব। তা'ছাড়া—এই বাজারে সব জিনিষের দামও ত' নেহাৎ কম নয়।"

এমনি ভাবে কাটতে থাকে দিনের পর দিনগুলো। পরিবর্ত্তনশীল এই বিশ্ব সংসার। নিয়তির আবর্ত্তনকে এড়িয়ে যাবার শক্তি কা'র নেই! মানুষের অদৃষ্ট ছাড়া পথ কোথায়! তাই ওদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বুকে আঘাত হেনে এমন একটা দিনের আবির্ভাব হ'ল—যেদিন——

"জানি। কিন্তু এই কথাটা প্রথমেই আমার দাদুকে তোমার বাবার বলা উচিত ছিল না কি ? ছি! ছি! ছি! ভাবতেও ঘৃণা হয়! তোমার মা-ই না একদিন আমাকে

উপদেশ দিয়েছিলেন—"সত্যকে কখন' পরিত্যাগ কোরনা"—আর আজ ? একথা ভাবতেও আমার লজ্জায় মাথাটা হেঁট হয়ে আসে ! কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হ'বার জন্যে কত নিছক্ অভিনয়ই না তিনি করলেন আমাদের সঙ্গে। আরও বেশী আশ্চর্য্য হচ্ছি শুধু এই কথাটা ভেবে যে, মা হয়ে কেমন ক'রে তিনি অবাধে মিশ্‌তে দিলেন তাঁর যুবতী মেয়েকে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে ! নভেলে পড়েছি—নাটকে দেখেছি, কিন্তু বাস্তবে যে এমন কোনদিন ঘ'টতে পারে তা' আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। বন্ধু-বান্ধবদের মুখে বালিগঞ্জের আখ্যান শুনে অতিরঞ্জিত বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু তোমাদের এই ঘৃণিত ব্যাপারটাকেত' নভেলিয়ানা বলে মেনে নিতে পারি না—মনে নেওয়াত' দূরের কথা।"

"আমার বাপ-মার ওপর রাগ ক'রে আমাকে তুমি ত্যাগ ক'রতে চলেছ। আর কেউ জানুক না জানুক—তুমিত' জান আমি তোমায় কতখানি ভালবাসি। তুমি চলে যাবে—বিয়েও হয়ত' আমার অন্য কোথাও হ'য়ে যাবে। কিন্তু সেখানে আমি যে কত শান্তি পা'ব তাত' তুমি বুঝতে পারছ লেখক। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে যে ভা'ববার অবকাশ পায়নি—যে ভালবাসা পাবার আশায় কত কত ভবিষ্যৎ-কল্পনায় আত্মভোলা হয়ে যে তোমাকে নারীর মান, মর্য্যাদা, লজ্জা, হৃদয়, মন এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে দান করে ফেলেছে—তাকে আজ এইভাবে ভাসিয়ে দিতে কি তুমি পা'রবে লেখক !

প্রেমের চেয়ে পণের মূল্যই কি হবে বেশী! একবার ভেবে দেখ—এই পোড়ামুখ আমি কেমন করে লোকের কাছে দেখাব। আমার বাপ-মায়েরই বা কি অবস্থা হ'বে।"

প্রেমের চেয়ে পণের মূল্য তখনই বেশী হয়, যখন সেটা প্রমাণ হয়ে পড়ে অভিনয় বলে। সত্যি কথা বলতে কি—তুমি চাওনা সুখ—চাওনা শান্তি। তুমি যাকে বিয়ে বলছ, জগতের অভিধানে সেটাকে ঠিক্ বিয়ে বলে না। কারণ তুমি চাও বিয়ের নাম দিয়ে নিজের কুমারী নামটা দূর কর্তে—আর ধবধবে সাদা তোমার ওই কর্করে সিঁথিটায় খানিকটা সিঁদূর ঢেলে দিয়ে সতীত্বের গর্ব্ব নিয়ে লোকের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে—যেমন আর একবার দাঁড়াতে চেয়েছিলে সতীশের পাশে আমারই মত তাকেও স্বামী বলে—যাক্ এখন ওসব কথা। কিন্তু তোমার ভাবা উচিত ছিল শান্তি যে তোমার স্বার্থটাকে বজায় রাখ্বার জন্যে আর একজন হয়ত সে সহযোগীতায় আত্মবলিদান নাও দিতে পারে। আচ্ছা—বিদায়। এই রাত্রের ট্রেণেই আমি কোলকাতা চললাম—কারণ এ জায়গাটা আর আমার কাছে নিরাপদ বলে মনে হয় না।"

"দাড়াও লেখক! চলেই যদি যা'বে তবে বলে যাও আমি কি ক'রব?"

"তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার মত বুদ্ধির দৌড়ত' আমার নেই শান্তি! তুমি কি ক'রবে না ক'রবে সে তোমার মা-ই দেবেন বলে। বিদায়।"

—এই হচ্ছে আপনার অভিনয়াংশের মোটামুটি কথা ও কাহিনী অলকবাবু। তারপর প্রযোজক মশাইয়ের বায়না অনুযায়ী প্লটটা গেল ঘুরে। যদিও, বইখানা ট্রাজেডী হলেই ভাল হ'ত, কিন্তু কমেডীই তাকে করতে হ'ল। মাঝে পড়ে রইল অনেক অনেক ঘটনা। সে সব অবশ্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শেষ পর্য্যন্ত সুশীলের সাথেই হল শান্তির বিয়ে। আজ মহরতের দিনে সেই শুভ-বিবাহের সর্টটাই নেওয়া হ'বে। শান্তির সঙ্গে শুভ-দৃষ্টির কালে সুশীলের মুখে ফুটে উঠবে অতীতের যত ঘৃণা—আর শান্তির চোখে উছলে প'ড়বে বিজয়-গর্ব্বের লোলুপ চাহনী। সিন্‌টা যদিও dumb—কিন্তু এই সিন্‌টায় আপনাদের দুজনেরই Feature activity বড্ড বেশী। যাক্—আমি কিন্তু আর দেরী করতে পারি না। আপনারা সব তৈরীত ?

"Silent please. Full light.···Moniter ?···O. K.

পরিচালক মিঃ হাজরা গুরুগম্ভীর স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"Start"

ইতিমধ্যে সহকারী পরিচালক শ্রীমান অনু সেন গুড়ি গুড়ি এগিয়ে এসে ক্ল্যাপষ্টিক্ মারফৎ announce ক'রলেন, "শান্তির বিয়ে—সর্ট নম্বর ১৯০।"

শাঁকের পর শাঁক বেজে উঠল। স্ত্রী-পুরুষের হুলুধ্বনিতে ষ্টুডিও ঘরখানা মুখরিত হ'য়ে উঠল। নেপথ্যে—"লুচি কই, দই কই" শব্দ নিনাদিত হ'তে লাগল—কোন সুদূর বনের

কৃত্রিম পাখীটা ঠিক্ সময় বুঝে কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠল, "চোখ্ গেল—চোখ্ গেল"। বাইরে সানাই-এর সুরে ভেসে এল, "তাই হৃদয় আমার হ'ল স্বয়ম্বরা"—ক্যামেরাটা angle থেকে angleএ ছুটে চল্‌ল।

নিয়মমত ক্যামেরাটা এসে দাঁড়াল এক জায়গায় স্থির হয়ে। সুরু হ'ল সুশীলের ভূমিকাবতীর্ণ অলোকবাবুর dumb feature activity—বিয়ের কনের ভূমিকায় শান্তিদেবীর বিজয়গর্ব্বভরা লোলুপ চাহনী।

আবার একটা ছোট্ট শব্দ—"Cut."

এক নিমিষে অতবড় হাঙ্গামাটা চুকে গেল। প্রযোজক মিঃ মুখার্জ্জি খুসীভরা মুখে এগিয়ে এসে পরিচালকের হাতে হাত মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"Excellent"

বাইরের প্রতিক্ষারত দর্শক বন্ধুরা ছবির মাজে একটা ideal কিছু পা'বার আশায় শুভ-বিবাহের দিন গুণতে লাগলেন। Publicity officer "Stick No Bills" নিয়ম লজ্ঘন করে দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে চল্‌ল, "শান্তির বিয়ে।"

ভগ্নদূত—২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৫

পরাজয়

"শেষ পর্য্যন্ত তোমার মনে কি এই ছিল প্রতাপ! সে দিনকার সেই প্রেমের উচ্ছ্বাস—সে কি তোমার শুধুই অভিনয়! না—না প্রতাপ! তা' আমি বিশ্বাস করি না, এ কখন হ'তে পারে না! উভয়ের প্রতি উভয়ের যে প্রেম, সে কখন মিথ্যে হ'তে পারে! একবার ভেবে দেখ প্রতাপ সেই সেদিনের কথা—যেদিন—ও কি! তোমার মুখে বিদ্রূপের হাসি! না-না, তোমার ছু'টী পায়ে পড়ি, অমন ক'রে আর তুমি হেস না—ও আমার অসহ্য, ও আমার—"

সুপ্রভা নিরুপায় হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ছু'হাতে মুখ ঢাকে। তা' দেখে প্রতাপ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিকট হাসির চোটে কাঁপিয়ে তোলে সারা- ঘরখানাকে। সুপ্রভা চম্‌কে ওঠে। ভয়-পাওয়া চোখ ছুটো নিয়ে সে শুধু তাকিয়ে থাকে প্রতাপের মুখের পানে। চোখ ছুটো যেন তার ফেটে বেড়িয়ে আসতে চায়—বুকের পাঁজরা ক'খানা জড়িয়ে তাল পাকিয়ে ওঠে—হাঁটু ছুটো কাঁপতে কাঁপতে তাল্-ঠোকা-ঠুকি সুরু করে দেয়! কাঁপা-গলায় সুপ্রভা বলে, 'এ আবার তোমার কি রূপ প্রতাপ! এমন ত' তোমায় আমি কখন দেখিনি!

প্রতাপ কয়েক পা এগিয়ে এসে সুপ্রভার মুখের কাছে মুখ রেখে গম্ভীর গলায় বলে, "তুমি নারী—আমি পুরুষ। একান্ত অবুঝ শিশুর মতই চেয়েছিলে তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে—যেমন আর আর মেয়েরা চায়। মনে পড়ে সুপ্রভা সেই সেদিনের কথা? যেদিন ট্রামে—ভীড়ের মাঝে হয়ত' বা একান্ত অসাবধানে এই দেহখানি বুঝি বা আলগোছা পেয়েছিল তোমার ছোঁয়াচ? নারীত্বের গর্ব্ব নিয়ে, সতীত্বের অভিনয় দেখাতে, তুমি আমার গালে হেনে বসেছিলে তোমার ওই শ্রীচরণেষু খানি?"

"কিন্তু তারপর ত' অনুতাপের তীব্র জ্বালায় আমি তোমার বাড়ী গিয়ে মাপ্ চেয়ে এসেছি—মার্জ্জনাও ত' পেয়েছি প্রতাপ?"

"চমৎকার ধারণা! হাজার পুরুষের সামনে করলে পুরুষের অপমান—আর একান্ত নিভৃতে, শুষ্ক একটা হাতের প্রণামে মেগে নিলে আপন মার্জ্জনা! বোঝালে আমায়—বুঝিবা নিঃশেষে মুছে গেছে যত কিছু কালিমা!"

"কিন্তু তুমি ত' সব কিছু ভুলে গিয়ে—আমায় তোমার পাশে স্থান দিয়েছিলে? বিবাহের প্রতিশ্রুতিও ত' দিয়েছিলে প্রতাপ?"

"হাঁ—দিয়েছিলাম। কিন্তু কেন জান? কারণ, ওটুকু অভিনয় না করলে আমার প্রতিশোধ নেবার পথ পরিষ্কার হ'ত না—আমাদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ হ'ত না বলে'। কিন্তু

তাই বলে আজও কি তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমায় বিয়ে করব সুপ্রভা ?”

“তুমি আমায় বিয়ে করবে না ? সে কি কথা প্রতাপ ? এই যদি তোমার মনে ছিল—তবে কেন তুমি তুলে দিলে এই কলঙ্কের পাষাণ চাপ আমার মাথায় ? উঃ—প্রতাপ ! তুমি কি এতই নিষ্ঠুর !” সুপ্রভা আর আত্ম-সম্বরণ ক’রতে পারে না —তাই সে ডুকরে ওঠে কেঁদে। তা’ দেখে প্রতাপ পৈশাচিক উন্মাদনায় হো-হো করে’ ওঠে হেসে।

এ হাসিতে সুপ্রভা আর ভয় পায় না। সে নিজেকে সামলে নিয়ে সাহসে ফুলে ওঠা ঘাড়খানাকে খাড়া করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ বলে বসে, “শয়তান পুরুষ ! মনে রেখ এটা বিংশতী যুগ। এ যুগটা একটা ছেলে খেলার যুগ নয়। এ যুগের মেয়েরা পুরুষের কাছে ভিক্ষার পাত্রী নয়। দেনাকে তারা কেয়ার করে না—পাওনাটা তারা আদায় করে নেবার শক্তি রাখে। আমি তোমাকে পুলিশে দেব—আমি তোমাকে ঘানি টানাব—আমি তোমাকে পাথর ভাঙাব। অনুশোচনার তীব্র দাহনে তুমি তিলে তিলে দগ্ধে মরবে।”

“আমিও তাই চাই সুপ্রভা—আমিও তাই চাই। আমি চাই তোমাকে আমাকে নিয়ে জগৎ মাঝে এমন একটা কিছু ঘটুক্ —যা নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর চেয়েও মর্ম্মান্তিক—সর্পাঘাতের চেয়েও জ্বালাময়। তাই কর সুপ্রভা —তাই কর। আমাকে পুলিশে দাও। কাগজ ওয়ালাদের

খোরাক জুটুক—সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবার বিখ্যাত রায় বংশের মাথাটা হেঁট হোক্। আর তা' যদি না পার—রাতারাতি একটা বিয়ে করে, একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে, অন্ততঃ সাময়িক একটু শান্তি অনুভব কর।"

"এ সব তুমি পাগলের মত কি বক্‌ছ প্রতাপ? মনে হচ্ছে আজ তুমি কিছু নেশা করেছ! মন স্থির কর প্রতাপ। আমি ভুলে যাব তোমার যত কিছু দুর্ব্যবহার। এস—দুজনে মিলে আমাদের এই প্রতিক্ষান্মুখ শিশুকে নিয়ে সুখের নীড় বাঁধি সেখানে—যেখানে আকাশের নীলিমা আর ধরণীর শ্যামল বনানী এক হ'য়ে মিশে গেছে বলে হয় ভ্রম—ও পাড়ের আলো আর এপাড়ের ছায়ায় যেখানে হয় নিভৃত মিলন—যে দূর কান্তার হতে নামহারা পাখী গায় গান—যে সুদূর বন হতে ভেসে আসে মহুয়া-সুবাস! চল—প্রতাপ—চল! সেখানে দু'টীতে গিয়ে বাঁধিগে কুটীর! থাকবে না সেখানে কোন সমাজ বন্ধন। সেথা শুধু তুমি আর আমি—মাঝে রবে' আনন্দ দুলাল।" সুপ্রভা থেমে যায়—আবেশে বুজে আসে চোখ—কল্পনার-মুকুরে ভাসে বাস্তবের ছবি।

কিন্তু প্রতাপ!

সে ভুল্‌বার ছেলে নয়। তাই আবার সে হো হো করে হেসে ওঠে বিদ্রূপের হাসি। তারপর হাসির বেগ্‌টা সম্ভব মত সংযত করে বলে, "সুপ্রভা! তোমার ফিলিমে যাওয়া উচিৎ ছিল। ভবিষ্যতে স্বনাম-ধন্যা অভিনেত্রী, চাই কি ডাইরেক্টরও

হতে পারতে। ঘরে ঘরে তোমার নাম, এমন কি ছবি পর্য্যন্ত সমাদরে স্থান পেত'। রাশি রাশি পয়সা রোজগার করতে পারতে—পরকিয়া কারবারও মন্দ চল্‌ত না। কিন্তু—"

"থাম প্রতাপ!" সুপ্রভা বাধা দিয়ে বলে, "তোমার চোখে আজকালকার মেয়েরা যেমনই হোক, তাদের পদদলিত করে পুরুষকে বাড়িয়ে তোলবার ব্যর্থ প্রয়াস তুমি কোর না। শঠতায়-ভরা এ প্রচেষ্টাকে সফল হ'তে আমি দেব না। শিক্ষার যদি কোন মূল্য থাকে—নারীর সরলতা যদি আজও জীবিত থাকে, তা' হলে শুনে রাখ প্রতাপ! কালই—সূর্য্যোদয়ের পরই তুমি এর প্রতিফল পাবে। যাও আপাততঃ এখান হতে বিদায় নিতে পার।"

……"পুরুষ-বিদ্বেষী এই নারী! এদের এই বিদ্রোহের অভিযান আর কত সহ্য করা যায়! ঠিক্ হয়েছে—সুপ্রভাকে সে ভাসিয়ে দিয়েছে—দানের যোগ্য প্রতিদানই দেওয়া হয়েছে। উঃ! কি ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ এই মেয়ে জাতটা! বিপদ-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে—তবু তার আস্ফালন দেখ! বলে কি না, "কালই এর প্রতিফল পাবে?" আরে বাবা ভুলে যাস কেন? হাজার হোক তোরা হচ্ছিস মেয়ে—আর আমরা হচ্ছি পুরুষ! এ যে আকাশ পাতাল তফাৎ বাবা! ঠিক্ হয়েছে। যেমন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া—নাও এইবার ঠেলা বোঝ!" অতি স্বস্তি সহকারে মনে মনে কথা কয়টি বলে, কোঁচার টেপ্‌টা গায়ে দিয়ে, হাই তুল্‌তে তুল্‌তে প্রতাপ চলল সামনেই ওই

নারায়নের দোকানে একটু গরম জলের (চা) চেষ্টায়—একান্ত অন্য মনস্ক ভাবে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হল এক পাঁচ-ছ' বছরের ভিক্ষুক সন্তান। অনাহারে শুকিয়ে গেছে তার দেহ— মলিনতায় ছেয়ে গেছে তার সারাটা অঙ্গ। ছুটে এসে প্রতাপের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে ছেলেটি কেঁদে বল্লে, "এতদিন আমাদের ফেলে তুমি কোথায় ছিলে বাবা ?"

"বাবা !! এ আবার কি ! কি স্পর্দ্ধা এই ভিখিরীর-পোর ! বলে কিনা—ছাড় হতভাগা—পা ছাড় বলছি ? দূর হ' এখান থেকে। আ-ম-র, এ যে ছাড়ে না ! আঃ কি বিপদেই পড়লাম গা এই সকাল বেলা !" প্রতাপ বিশেষ বিব্রত হ'য়ে প'ড়ল।

দেখতে দেখতে রাস্তায় জমে উঠল ভীষণ জনতা। ভিখিরীর পো'র সম্বোধনে সকলেরই মুখে বিদ্রূপের হাসি। এর মধ্যে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করতেও সুরু করে দিয়েছে। কোথা হতে এক উর্দ্ধ-ষোড়শী-ভিখারিণী ইতি মধ্যে প্রতাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখলে মনে হয় বুঝিবা দীর্ঘ-কাল বিরহের পর এই মিলনে তার যেন আনন্দের আর সীমা নেই ! হঠাৎ গায়ে গা ঠেকাতে প্রতাপ একটু সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখতে পায় পার্শ্ব সহচরীকে—অস্ফুটে মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে আসে, "তুমি আবার কে—?"

এ কথায় চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে ভিখারিণী প্রতাপে

পা' দুটো জড়িয়ে ধরে কান্না-পাওয়া গলায় বলতে থাকে, "ও গো! এবার তুমি ঘরে চল, রোজ্‌গার করতে পার আর নাই পার—আমি ভিক্ষে করেও তোমায় খাওয়াব।"

জনতা বিদ্রূপ ভরে অট্টহাসি হেসে ওঠে। প্রতাপ তার সবটুকু আবেগ দিয়ে—তার সবটুকু চেঁচাবার শক্তি দিয়ে জনতাকে বোঝাতে চাইল বুঝিবা কতই না কি! কিন্তু হায়! কে শোনে—কার কথা! কল-কোলাহলে সবই হয়ে গেল লীন্। বুঝেও কেউ বুঝল না প্রতাপের এই অপমানে ভরা নিদারুণ কাহিনী। তাই নিঃসহায় প্রতাপের মাথাটা আপনা হ'তে হয়ে গেল হেঁট। এমন সময় হৈ হৈ করে ভীড় ঠেলে সেখানে হাজির হ'ল রঙ্-বেরঙেএর সাড়ী পরা কতকগুলি মেয়ে—প্রতাপের সামনে। তারপর, প্রতাপের আন্‌মনা-দৃষ্টি প্রথমেই আবিষ্কার ক'রল তার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা সুপ্রভাকে। ভিখারিণী তখনও প্রতাপের পা'দুটী জড়িয়ে ধরে আছে—ছেলেটী হাঁটু দুটো তখনও ছাড়েনি—তখনও তার মুখের বুলি শেষ হয়নি—তখনও সে থেকে থেকে বলে চলেছে, "বাবা! এবার তুমি ঘরে চল।"

ব্যাপার দেখে মেয়ের দল খিল্ খিলিয়ে হেসে উঠল—। এ ওর গা টিপে কত কিই না বলে চলল তারা।

প্রতাপ হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গত দিনের কথাগুলো ভাবতে লাগল।

···কে যেন তার হাত ধরে কোথায় টেনে নিয়ে চলল—

তার পরই মোটারের ষ্টার্ট—গাড়ীর ঝাঁকুনি। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, চেয়ে দেখল, ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে বসে রয়েছে কেবল সব মেয়ে আর মেয়ে! এ যেন প্রমীলার যুদ্ধ—সে যেন বন্দীবীর!

গাড়ী থেমে গেল। প্রতাপ আশ্চর্য্য হল—এইত' সেই বাড়ী! এই ত' সেই ঘর—যে ঘরে সুপ্রভার সঙ্গে হয়েছিল তার প্রথম প্রেমের অভিনয়! এইত' সেই বাড়ী—যে বাড়ীটা সুপ্রভার মামা মৃত্যুকালে তাকে করে গেছে দান!

......."দেখুন মিঃ বোস্! যা' যা' বলব, ঠিক্ ঠিক্ তাই করে যান্। নতুবা—দেখছেন ত' এই বন্দুক?" কথা কটা বলে মহা-গম্ভীরভাবে মালতী বন্দুকটা সোজা করে তুলে ধরে' প্রতাপের বুকের ওপর—যেন গুলি করে করে এমনি এক ভঙ্গিমায়।

প্রতাপ চম্‌কে ওঠে। তাই অত্যন্ত ভয়-পাওয়া গলায় সে বলে বসে, "কি ছেলেমানুষী করছেন মালতী দেবী! গুলি ভরা পিস্তল—যদি কোন প্রকারে ঘোড়াটা একবার—"

—"মৃত্যু নিশ্চিত!" মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দেয় মালতী—বক্র ঠোঁটে ফুটে ওঠে তার বিদ্রূপের হাসি। তারপর ইঙ্গিতে জানাল মালতী বাকী সব মেয়েদের আসল কাজটুকু তাড়াতাড়ি নিতে সেরে।

শাঁখ বাজাল, হুলু দিল—আরও কত কি সব ক'রল তারা! অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটীই হ'ল না—প্রতাপ আর সুপ্রভার এই পাকাপাকী বন্ধনে।

বর-কনে বাসরে ব'সল।

মালতী বন্দুকটা সুপ্রভার হাতে তুলে দিয়ে একটু হেসে বললে, "নে ভাই প্রভা! কাঠের পুতুলেরই মত নিষ্কর্ম্মা এই বন্দুকটা—যা দেখে আমাদের এই পুরুষ বন্ধুটীর আত্মারাম হ'য়েছিল প্রায় খাঁচা ছাড়া—তোদের মিলনে এইটাই হ'ল আমার দেওয়া প্রীতি-উপহার। আমাদের কাজ শেষ হ'ল, এখন আমরা সব চল্লুম। দরকার হ'লে তলব ক'রতে যেন ভুল না হয়।"

সকলে চলে গেল। প্রতাপ মাথা নীচু করে ভাব্‌তে লা'গল—এ তার 'পরাজয়'—না 'মৃত্যু'।

নওরোজ—পৌষ—১৩৫১

আভা

"এই যা! সন্দেশের হাঁড়িটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল! আ—হা হা! অত গুলো সন্দেশ—আচ্ছা আমি আবার দোকান থেকে এনে দিচ্ছি।"

লেখা আচম্বিতে সালজ্জ দৃষ্টি হানে তার পাশে—যুবক ছুটে চলে ষ্টেশনের পাশের ওই খাবারের দোকানটায়।

ঢং—ঢং—ঢং

শেষ শব্দটুকু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ সুরু করে তার এগিয়ে চলার অভিযান।

লেখার বাবা জানান হাজার অনিচ্ছা, ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হওয়া যুবকের দেয় সন্দেশ গ্রহণে। যুবক একান্ত নিরুপায় দেখে সুরু করে চমৎকার মন-ধাঁধান অভিনয়ের মহড়া। তাই সে মহা দুঃখের ভান করে বলে, "আমি হচ্ছি আপনার একান্ত আপন জন। বৌদির হাতে মিষ্টি দেওয়া ও খাওয়ার অধিকার আমার আছে বলেই আজ আমার এই দুঃসাহসের অভিযান। এততেও যদি আপনি গড়রাজী—তাহ'লে বাধ্য হয়ে আমায় সন্দেশগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে—কঠিন ওই রেল-লাইনের ওপর নিষ্ঠুরভাবে হাঁড়িটাকে আছাড় মেরে। কিন্তু তার আগেও আমি আপনার অনুমতি চাই। কারণ তা'—না হ'লে আপনি হয়ত' বলে ব'সবেন—আজকে যুগের ছেলেরা নাকি

বড় অমিতব্যায়ী। অবশ্য ও কথাটা যদি আপনি আমাকে বলেনও—তাহ'লে বিশেষ অন্যায় কথা আপনার বলা হবে না। কারণ, বাপের একমাত্র ছেলে হয়ে অমিতব্যায়ীতার পরিচয় যে আমি দিইনি তা' নয়। কোলকাতার ওই অতগুলো বাড়ী থাকা সত্বেও মধুপুরের নবনির্ম্মিত কুঞ্জকুটীরখানি এখন তার স্বাক্ষী দিচ্ছে। বড়দার বিয়েতে লেখা-বৌদিকে উপহার দেওয়া সেই প্রকাণ্ড পেষ্ট বোর্ডের জাহাজখানাও আপনাকে মনে করিয়ে দেবে আমার অমিতব্যায়িতার কথা। কিন্তু যাক্ ও সব বাজে কথা। এখন বলুনত' বিজলীবাবু—সন্দেশের হাঁড়িটাকে এভাবে ধ'রে হাওয়া খাওয়াব—না ওই লোহার লাইনে আছাড়ে ফেলে এর বংশের সদগতি করব ?"

বিজলীবাবু মহাব্যস্ত হয়ে হাঁড়ি'বংশকে আপাততঃ ধ্বংশের হাত থেকে বাঁচিয়ে—যুবককে আপন পাশে বসিয়ে জিগ্গেস করেন তার সঙ্গে তাঁর পরিচয়টুকু। যুবক রনেশ পরিচয়ে জানিয়ে দেয় সে নাকি লেখার স্বামীর কোন দূর সম্পর্কের জ্যাঠার ছেলে। যুদ্ধের বাজারে চাকরী সুত্রে থাকে নাকি সে দূর হতে বহুদূরে। বড়দার বিয়ের রাতে—নববধূ লেখা-বৌদির সাথে নাকি তার এমন পরিচয় হয়েছিল, যা নাকি আর কার সঙ্গে হওয়া সম্ভব হয়নি। আর আজকের দিনে এই নাকি তার সব চেয়ে বড় দুঃখ—সেই লেখা-বৌদিই নাকি আজ তা'কে সামনা সামনি দেখেও চিনতে পা'রল না!

রনেশের কথায় লেখা মনে মনে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে'।

তাই সে নিজেকে সামলে নিয়ে মহাবুদ্ধিমতীর পরিচয় দিয়ে বলে, "না ঠাকুর পো না! ভুলে তোমায় আমি যাইনি—কিন্তু যাচ্ছ কোথায় এখন তাই শুনি ?"

রনেশ হেসে উত্তর দেয়, "তোমাদেরই অতিথি হ'বার অভিপ্রায়ে, তোমাদেরই ভবনে।"

বিজলীবাবু মহাখুশী—লেখার চোখে মুখে উছলে পড়ে আনন্দের ছটা—তাই হাত দুটো জোড় করে—অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে, "হে অনাহূত অতিথি—স্বাগতম্।" "wel-come"!

বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত একে একে অতিক্রম করে ট্রেণ ছুটে চল্‌ল তার অভিষ্ট স্থানের উদ্দেশে। কেহ নামে, কেহ ওঠে,—আবার কেহ বা পরের ওঠা-নামার মাঝে হারিয়ে ফেলে আপন গতিটুকু। আলোকে-আঁধারে আপন মনে রেল ছুটে চলে আগের পানে। সকলকে পিছনে ফেলে যাওয়াই যেন তার শাশ্বত জীবনের দৈনন্দিন ব্রত। কেবল তার সম্বন্ধ—পরের হাতে নিজের মুখের লাগামটুকুর ওপর। তাই লাগাম টানার ভঙ্গিমাটুকুর ওপরই নির্ভর করে তার চলে-যাওয়ার ছন্দ-টুকু। হাসি নেই, কান্না নেই—সুখ নেই, দুঃখ নেই—ছোট-বড় নিশ্বাস-টুকুই নাকি তার জীবন-মৃত্যুর দাঁড়িপাল্লা!

নদীর বাঁকে আম বাগানে ঘেরা ছোট গ্রাম খানি 'চঞ্চল'। তারই পাশে রেল ষ্টেশন। ট্রেণ এসে থামে। বিজলীবাবু, লেখা আর রনেশ ওখানে নেমে পড়ে। তার পরই আবার তাদের

সুরু হয় চলার পালা—অদূরে ওই লম্বা জোড়া তালগাছওয়ালা দ্বিতল বাড়ীখানার উদ্দেশ্যে।

বিজলীবাবুর মাতৃহীনা কনিষ্ঠা কন্যা আভা তখন সবে মাত্র তুলসী তলায় প্রদীপ দেখাতে যাচ্ছে—এমন সময় ওখানে হ'ল ওই তিনের আবির্ভাব।

আভা ষোড়শী—তায় রূপসী ! তাই রনেশের প্রথম দৃষ্টিকে আভা সেদিন এড়িয়ে যেতে পারেনি।

চারিদিকে ছোট বড় নানা রকম নানান্ ফুলের গাছ। মাঝখানে সিমেণ্ট করা গোলাকার খানিকটা জায়গা। মাথার ওপর জ্যোৎস্না-পুলকিত অতন্দ্র-আকাশ। তারই শুভ্র আলোকে দেখা যায় পাশের ওই নদীর বাঁকে এক গোছা কাশ। মাঝে মাঝে শোনা যায় পাখীর কূজন—চঞ্চল বাতাস করে কানাকানী।

রনেশ চেয়ে থাকে আভার পানে—মুখে তার ফুটে ওঠে তৃপ্তির আভাস।

"আচ্ছা রনুদা ! দিন রাত্তির এই বাড়ীর মধ্যে বন্দী থাক্‌তে তোমার ভাল লাগে ? আমি যদি পুরুষ হতুম—অথবা আজকে দিনের মেয়ের মত স্বাধীনতা পেতুম—তা'হলে দেখতে রনুদা,' জগত মাঝে কি কাণ্ডটাই না করে বেড়াতুম্ আমি।"

এর উত্তরে রনেশ আভার গালে মৃদু একটা পরশ হেনে বলে, "না আভা না—বন্দী হ'য়ে থাকা আমার স্বভাবসিদ্ধ নয়। এ বন্দীত্ব স্বীকার করা—কেবল আর এক বন্দীত্বকে খণ্ডন

ক'রবারই জন্যে—তাও তুমি কি জান না? আর জানবেই বা কেমন করে? শোন তবে বলি। জীবনের সে এক অতীত দিনে, না জানি সে কোন্ খেয়ালের বশে—নাম লেখালাম যুদ্ধে। দূর দেশের চাকরী জীবন অচিরেই ঠে'কল বড় একঘেয়ে। তাই একদিন কাউকে কিছু না বলে'-কয়েই সেখান থেকে স্থরু ক'রলাম পলায়নের যাত্রা। পথেই শুনি—আমারই সন্ধানে লোক ছুটেছে দেশ হতে দেশান্তরে। একান্ত নিরুপায় হ'য়ে রেল-ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি আকাশ-পাতাল কতই না কি? এমন সময় চমক দিল তোমার দিদির হাতের ওই সন্দেশের হাঁড়িটা—মাটিতে আঘাত পেয়ে সশব্দে চেঁচিয়ে উঠে। কিন্তু—হাঁ—যার জন্যে এত ভনিতা সেই কথাটাই এখন তোমায় বলা হয়নি। আজ আমার অজ্ঞাতবাস ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আত্মপ্রকাশ যদি কোন প্রকারে শেষ পর্য্যন্ত হয়েই পড়ে—তাহলে—"

"বুঝেছি রনুদা—সবই বুঝেছি! বাপ্‌রে! ও কথাটা মনে করলেও প্রাণের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে! কাজ নেই বাপু বাইরে গিয়ে। কিন্তু এরকম আত্মগোপনই বা কত দিন সম্ভব।"

—"যত দিন তুমি আমাকে"—

হঠাৎ রনেশ বাধা পায় লেখার অপ্রত্যাশিত আগমনে। তাই রনেশ হঠাৎ চমকে উঠে পিছন ফিরে চায়—লজ্জা-পাওয়া আভা ছুটে পালায়।

"না—তা হয় না ঠাকুরপো। আভা কুমারী—তার সঙ্গে তোমার একটা পাকাপাকী ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তোমাদের উভয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে, বাবা—অর্থাৎ তোমার বিজলী-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ঠিক করেছি, আগামী রাখি-পূর্ণিমার দিনই তোমাদের উভয়কে পরিণয়-বন্ধনে বাঁধা হ'বে। আভার জামাইবাবু—অর্থাৎ তোমার বড়দা'কেও এ খবরটা দেওয়া হয়েছে। তিনি খুব সম্ভব দু-এক দিনের মধ্যে এসেও পড়বেন।"

"বৌদি! আপনারা যে ভেতরে ভেতরে এতখানি তৈরী হয়েছেন—এ আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারিনি! কিন্তু বিয়েটা কি আর দু' এক মাস পরে ক'রলে চ'লতে পারে না?"

"না ঠাকুরপো—তা' আর কেমন করে হয় বল? কারণ—ওদিকে আভা যে বসে আছে মাতৃত্বের দাবী নিয়ে। সে দাবীর মর্য্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রা'খতে হ'লে—কালের মেয়াদটুকুর ওপর কড়া দৃষ্টি একটু রাখ্‌তে হ'বে বৈ কি! সত্যি ঠাকুরপো! কত মিথ্যে কথাই না আপনি জানেন! অভাগী আভাকে ফাঁকি দেবার জন্যে কত নিছক অভিনয় করবার চেষ্টাই না আপনি ক'রলেন! যুদ্ধে নাম দেওয়া—"

"বৌদি"—

"না-না-না! এখুনি এত লজ্জা রনেশবাবু! নারীর লোভে পুরুষের এত অধঃপতন! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এ কথা ভা'বতেও যে ঘৃণা হয় রনেশবাবু! বলিহারী আপনার বুকের পাটা! একটা কুমারীর সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্যে—"

"কিন্তু লেখা দেবী! আপনার বিচারে দোষী কি শুধু আমি একাই? একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবককে সামান্য শুধু তার কতকগুলো মুখের কথায় বিশ্বাস করে' যাকে আপনি আপন অন্দরে স্থান দিয়েছিলেন—আপনি কি বলতে চান লেখা দেবী—আজ আমাকে ভাবতে হবে ওই প্রশ্রয় পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধ্যেই কু-মতলবের ইঙ্গিত বেশী ছিল না? বিংশতী-যুগের ছেলে-মেয়েরা যে সমস্ত দোষে আজ জগত মাঝে অতীব ঘৃণ্য—তার মূল-তত্ব অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন বৌদি, তা' শুধু আপনারই মত মেয়ে অথবা অভিভাবক-দের অবহেলা বা মুর্খতার কারণেই সম্ভব হয়েছে। যাক্। বাজে তর্ক করে কোন লাভ নেই। বর্ত্তমানে আপনাকে আপনার স্থিরকৃত মতলব হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। অভিষ্ট আপনার পূরণ কখনই হ'তে পারে না। কারণ আমি বিবাহিত।"

"সে কি রনেশবাবু! আপনি বিবাহিত! তবে কেন—কেন আপনি আমাদের এ সর্ব্বনাশ করলেন?"

"মিথ্যে আপনি বিচলিত হচ্ছেন লেখা দেবী! কারণ—এ ত' অনাহুত বিপদ নয়! যে বিপদকে আপনি সাদরে আহ্বান ক'রে এনে বরণ করে ঘরে তুলেছেন, তা' দেখে আমাকে কি আজ ভাবতে হ'বে লেখা দেবী—পূর্ব্ব হতে তার জন্যে আপনি প্রস্তুত হয়ে না আছেন? কিন্তু এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা যে, তার গুরুত্বটুকু উপলব্ধি ক'রতে আপনি পারেন নি। আর শুধু ওই কারণেই আজ আপনি এ হেন গুরুদণ্ডের

সম্মুখীন। তাই আজ আপনাকে দিয়েই জগতকে একটু শিক্ষা আমি দিতে চাই। জগৎ দেখুক—বর্ত্তমান যুগেয় ছেলে-মেয়েরা বাস্তবিকই তাদের অভিভাবকদের .বাদ দিয়ে সত্যিকার নিজেরা কোন দোষে দোষী কি না! কুমারীর সন্তান—সধবার একাদশীর মতই ভিত্তিহীন—চমকপ্রদ—দোষনীয়। কিন্তু তবু আজকের দিনে তাও সম্ভব হচ্ছে! কিন্তু কেন—কাদের জন্যে ব'লতে পারেন লেখা দেবী?"

"দোষ যে কারণে যাদের জন্যেই হোক ঠাকুরপো—শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে গেলে সে সমস্যার সমাধান ত' হওয়া প্রয়োজন!"

"নিশ্চয়—প্রয়োজন বই কি।"

"বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের উপায় কি স্থির করেছেন?'

"কেন? সদুপায়? আভাকে বিবাহ?"

"কিন্তু—এই না বললেন আপনি বিবাহিত?"

"বিবাহিত—কিন্তু মৃতদার।"

"তা' হ'লে এটা কি আপনার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ রনেশবাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ। শুনুন লেখা বৌদি! আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করে' আপনি আমাকে গৃহে স্থান দিয়ে ছিলেন, আবার আমারই কথায় বিশ্বাস করে' আপনি আমাকে প্রতারণার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই আমি তা' নই। আপনারই পিছনে সদ্য আগত আমার বড়দা', ওঁকে

আপনার স্বামী, এখন স্যুট্‌কেশ হস্তে দণ্ডায়মান। আপনার সংশয় দূর ক'রতে ঐ উনিই হচ্ছেন আপনার এই অকূলে ভেসে যাওয়া তরীর একমাত্র কর্ণধার। তাই বলি'—আর দেরী কেন বৌদি! আভাকে ডাকুন—ধান-দূর্ব্বা নিয়ে আসুন, জ্যেষ্ঠেরই সামনে কনিষ্ঠের পরিণয় কার্য্যটা সমাধা হোক্। যাক্ আমি "বিবাহিত বা মৃতদার" কোনটাই নই বৌদি—আসলে আমি আইবুড়ো কার্ত্তিকের মতই কুমার।"

"আঃ—বাঁচলুম! খুব শিক্ষাটা তুমি কিন্তু আমাকে দিলে ঠাকুরপো!"

"এ শিক্ষা শুধু আজ তোমার পাওয়া নয় বৌদি—ঠিক্ এই রকম শিক্ষাই আজ সারা জগৎবাসীর বড় প্রয়োজন।"

———

নওরোজ—জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১

একটা সর্ট

"না—না—না রেবা দেবী! এ আপনার কিচ্ছু হচ্ছে না! এতবার রিহার্সাল দিয়েও এই সামান্য পোজ্‌টুকু, এই সামান্য কথা-ক'টা আর আপনার মনে থাকছে না? আশ্চর্য্য! আপনার হ'ল কি?"—কৃত্রিম ক্রোধের ভাণ করে এক নিশ্বাসে কথা ক'টা বলে ফেলে—ডাইরেক্টর মিঃ বোস্ আড়ালে হাসেন একটু মুচ্‌কি হাসি।

"আজ আমার কিছুই হয়নি। মিথ্যে পাওয়ার চেয়ে চাওয়ার দাবী বেশী ক'রবেন না মিঃ বোস্!"—রেবা স্বীয় ক্রোধ সম্বরণ ক'রে উত্তর দেয়।

"তার মানে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এ পার্ট আপনার মত সামান্যা অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনয় করা সম্ভব নয়।"—মিঃ বোসের চোখে বিদ্রুপের চাহনি।

"আমিও বেশ বু'ঝতে পারছি—মিঃ বোস, আজকাল অকারণে অভিনেত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে—আপন অক্ষমতাকে চাপা দিবার ব্রতে ব্রতী হয়েছেন বেশ একটু বেশী রকমই! নতুবা—" হঠাৎ থেমে যান রেবা দেবী, ক্রোধের উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে রঙিন্ তাঁর বঙ্কিম অধর দু'টী।

"রেবা দেবীর বোধ হয় মনে থা'কতে পারে যে Contract from এ Director মিঃ বোসের সঙ্গে সমান তালে ঝগড়া ক'রবার কথা বোধ হয় উল্লেখ ছিল না।"—বিমলেশ চশমার ফাঁক দিয়ে মিঃ বোসের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় শ্রীমতী রেবার শ্রীমুখে।

"মিঃ বোসকে প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছে হয়—সুটিং-এ আগত এতগুলো লোকের সামনে একজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রীকে এ ভাবে অপমান ক'রবার মত কোন অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত ওই ফর্ম্মে উল্লেখ ছিল কি না ?"—রেবার কণ্ঠস্বরে উত্তরের প্রতিক্ষা।

"ডাইরেক্টর মিঃ বোস্ ইতিপূর্ব্বে কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাছে তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার আগে তাঁদের Contract from cancellই ক'রে এসেছেন। প্রয়োজন হ'লে এ ক্ষেত্রেও তা'র ব্যতিক্রম ঘ'টবে ব'লে' মনে হয় না।"—কার্য্য অর্দ্ধ কৃতকার্য্য। পুনরায় আড়ালে হাসেন একটু মুচ্‌কি হাসি মিঃ বোস্।

"তবে এবার তার ব্যতিক্রম হ'তে এত বিলম্ব কেন ?" জানিবার প্রবল ইচ্ছামাখান ভাষা হঠাৎ বেড়িয়ে আসে রেবা-দেবীর মুখ হ'তে।

"বিলম্বের কারণ আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয় রেবা দেবী! কারণ—আজ পর্য্যন্ত যাঁ'রা এ ভাবে আমার কাছ হ'তে বিদায় নিয়েছেন—তাঁ'দের মধ্যে প্রায় সকলেরই ভাগ্যে ডাইনের শূন্য শেষ পর্য্যন্ত বাঁয়ে গিয়েই হাজির হ'য়েছে। তাই বলি—আপনার ভাগ্যেও শেষ পর্য্যন্ত হয় ত' বা"—অপ্রিয় কথাটা উহ্য রা'খলেন মিঃ বোস, কিন্তু তা' কারুর কাছেই গোপন রইল না।

"এর চেয়ে বেশী ব'লবার ক্ষমতা বোধ হয় আপনার নেই ? কিন্তু ভুলে যাবেন না মিঃ বোস্! পূজোর ছুটীর

পর প্রতিবারের মত এবারও আদালত খু'লবে। দরকার হ'লে আমার উকিল মিঃ রয়—চাইকি আমার নিজেরও সেখানে হাজির হ'বার ক্ষমতা আছে।"—রেবার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বীরত্বের লালিমা।

"তার পূর্ব্বে সে পথ রোধ ক'রবার শক্তি ও আমার আছে রেবা দেবী! কারণ—এখন আপনি এখান হ'তে বিদায় নিলে—যতখানি ছবি আপনার তোলা হয়েছে, নবাগতা অভিনেত্রীর সৌজন্যে তা' সবই আমাদের বাদ দিতে হ'বে। আর আজ-কালকার কালে ওই ফিলিমটুকুর দামও নেহাৎ কম নয়। ইতিপূর্ব্বে ঐ সমস্ত বিদায় গ্রহণকারীদের কাছ হ'তে আদালতই আমাদের বাঁচিয়ে এসেছে। সুতরাং আপনার বেলাতেও আদালত নিরপেক্ষ বিচারই করবে—সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।"—কার্য্য সিদ্ধির পথে। তাই মিঃ বোস্ নিকটস্থ অভিনেতাকে করেন ইঙ্গিত। ফট্ ফট্ ক'রে জ্বলে ওঠে তীব্র বিজলী বাতীগুলো ষ্টুডিওটাকে আলোয় আলোকিত ক'রে। অভিনেতা এগিয়ে যায় রেবার কাছে—সুরু হয় অভিনয়—

"মিথ্যে আদালতের ভয় আমায় দেখিও না রেবা! মনে রেখ—পুরুষ যখন তার বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তখন সৎ অসৎ—যে ভাবেই হোক্—ওপথের কাঁটাগুলো আগে হ'তে সরিয়ে ফেল্‌তে তা'র কোন ক্রমেই কোন দিন ভুল হয় না।"—উক্তির মাঝে ফুটে ওঠে অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্য।

"শয়তান পুরুষ! আপাত-মধুর-প্রলোভনে ভুলে' যে

অত্যাচার তুমি আজ ক'রতে চলেছ, তা'র বর্ত্তমান ফল যতই সুখপ্রদ হোক্ না কেন—মনে রেখ, তা'র প্রতিফল অতি ভয়ঙ্কর।"

রেবা চলে যেতে যায়, অভিনেতার ডাকে থম্‌কে ফিরে চায়।

"যাবার আগে শুনে যাও রেবা! তোমার ওপর কলঙ্ক আরোপ করাই হ'বে আজ হ'তে আমার লোকের চোক্ষে নিজের কলঙ্ক ঢা'কবার এক মাত্র প্রচেষ্টা।"

হঠাৎ রেবা ছুটে এসে আছড়ে পড়ে অভিনেতার পদতলে। কেঁদে বলে—"না—না! নারীর নামে কলঙ্ক দিয়ে ওগো পুরুষ! তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা তুমি কোর না। নারী—সে যে মাতৃজাতি! তুমি কি বু'ঝবে পুরুষ! কতটুকু সম্মানের আশায় কতখানি আঘাত সহ্য ক'রতে হয় এই প্রকৃতিকে! তুমি কি বু'ঝবে পুরুষ! ক্রীড়াচ্ছলে ফেলে দেওয়া তোমার ওই তীক্ষ্ণ কুঠারখানি—কতখানি দীর্ণ ক'রবে বিশ্বের এই মাতৃ-হৃদয়কে! একবার—শুধু একবার স্মরণ কর স্বামী—ঋষির মুখে উচ্চারিত সেই শ্লোক—সেই পুণ্য স্তোত্র—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

ডাইরেক্টর মিঃ বোস্ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন,—'কাট'। প্রযোজক মিঃ গুপ্ত এগিয়ে এসে মিঃ বোসের হাতে হাত ভিড়িয়ে এক মুখ হেসে ব'ললেন, "Excellent". কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি শুধু এই কথাটা ভেবে যে, এইটুকু একটা সর্ট নেবার জন্যে আপনাকে রেবা দেবীর সঙ্গে এতখানি ঝগড়া করতে হ'ল কেন!

"নকলের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এমনি ভাবেই হওয়া উচিৎ মিঃ গুপ্ত। তা' না হ'লে ফিলিম্ তোলার আভ্যন্তরিন উদ্দেশ্য যাই হোক,—একবার চাইলেই বেশ বোঝা যায় ছেলে ভুলিয়ে পয়সা নেওয়া ব্যবসাদারদের জোচ্চুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। আগের তুলনায় আজ এই শিল্প বিস্তারের পথে যে অনেক বেশী অগ্রগামী একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার ক'রবে। কিন্তু বলুন ত' মিঃ গুপ্ত—এদের মধ্যে প্রাণের সাড়া আপনি কতটুকু পেয়েছেন?"—মিঃ বোসের সদুত্তর নিঃসন্দেহ!

"কিন্তু—অভিনেত্রীর অপমান?"—বেঁকে দাঁড়ান মিঃ গুপ্ত!

"ওটা অপমান নয় মিঃ গুপ্ত—ওটা অপমান নয়। ওটা হচ্ছে গুরুর দিক্ষা।"—হেসে জবাব দেন মিঃ বোস।

"তা'হলে—অভিনেত্রীর সফলতা?"—উত্তর প্রতীক্ষায় প্রশ্ন করেন প্রযোজক মিঃ গুপ্ত।

"গুরু দক্ষিণায় আদর্শনীয়া মাতৃরূপা-ভারতীর দান।" —সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে ডাইরেক্টর মিঃ বোসের কাছ হ'তে।

প্রযোজক মহা খুসি—ডাইরেক্টরের চরম সফলতা। অভিনয় শেষে ফিরে যায় অভিনেত্রী আপন আলয়ে—অবগুণ্ঠনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে।

———

নওরোজ—আষাঢ়—১৩৫১

প্রতিমা

দেখ মানসদা'! আর তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে মিশনা! এ দেখে অনেকে অনেক কথাই বলে। তা'ছাড়া, ব'লবার তা'দের সুযোগও যথেষ্ট। কারণ—আজ আমরা উভয়েই বর্ত্তমান বয়সের যে ধাপে এসে পৌঁচেছি—তা'তে ক'রে লোকের ওই সমস্ত বিশ্রী ধারণা হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত ভিন্ন হওয়া উচিত নয় মানসদা'।"

"দেখ প্রতিমা! লোকের মুখের কথার ওপর নির্ভর ক'রে একটা কিছু পথ বেছে নেওয়াকে আমি বেশ সদ্‌যুক্তি বলে মনে করি না। কারণ,—তাতে আত্ম-স্বাধীনতার ঘটে অকালমৃত্যু। এ মৃত্যু মানুষকে কোন দিনই সুখী ক'রতে পারে না! বর্ত্তমান যুগের ছেলে-মেয়ে বলেই যে মানুষ ব'লবে আমাদের মন অতি নীচ হ'য়ে যা'বে—একথা আমরা মনের মাঝে মেনে নিতে নাও পারি প্রতিমা! মনের ক্ষমতাটুকুর মর্য্যাদাটুকু যদি আমরা যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখতে শিখি, তা'হ'লে আমার মনে হয় প্রতিমা, মানুষের মনগড়া কথাগুলো—একদিন নিশ্চয়ই আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হ'বে—আমাদের এই ছু'য়ে মিলে এক হওয়া জীবনধারাকে আদর্শ ব'লে মেনে নিতে। তাই আমি বলি, অনাগত ভবিষ্যতে···"

"কিন্তু মানসদা'—সমাজে বাস ক'রতে গেলে ওদের কথাত' আমাদের মানতেই হ'বে—তা' সে যতখানি অসত্যই হোক্!

সামাজিকতাকে বাদ দিয়ে চ'লবার মত ক্ষমতা ত' আমাদের নেই মানসদা'।"

"সমাজকে বাদ দেওয়ার মত কোন প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না প্রতিমা! সমাজকে অতিক্রম ক'রবার মত কোন চেষ্টাও আমরা করিনি। তা'ছাড়া, সামাজিক বিচারটাকে অন্যায় বা ভুলে পরিণত ক'রবার মত সদ্ইচ্ছাও বর্ত্তমানে আমাদের নেই! আমরা চেয়েছি মিথ্যে লোকাচারকে তুচ্ছ ক'রে, নিজেদের আদর্শ-টাকে বজায় রা'খতে, বর্ত্তমানে তা' লোকের কাছে যতখানিই বিসদৃশ হোক্ না কেন! তোমার আমার মধ্যে যে প্রেম—সে প্রেম যে কেবল অবৈধ—একথা ব'লতে আমি কাউকে দেব না। তোমার প্রতি আমার প্রেম, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রেমের মতই নির্ম্মল ও স্বচ্ছ—দেখ প্রতিমা, একথা জগতকে একবাক্যে স্বীকার একদিন ক'রতেই হ'বে! তাই বলছি—"

"নারী প্রগতির নেত্রী তোমার এই বান্ধবী প্রতিমা, যদি কোন দিন আপন ভ্রমে পিছলে পড়ে তা'র চলার পথে, যদি কোন দিন সে ভেসে যায় ওইসব কুৎসিত জোয়ারের টানে আপন কর্ম্মপথ হ'তে বিচ্যুত হয়ে, তা'হলে ভেবে দেখ মানসদা', এর চেয়ে দুর্ভাগ্য নারীদের আর কি হ'তে পারে!"

"তুমি আমায় অবাক্ করলে প্রতিমা!' আমি শুধু এই কথটাই ভাবছি—যে এই ভঙ্গুর উদ্দম নিয়ে তুমি কেমন ক'রে ওই অত বড় একটা প্রগতির পাষাণ চাপ মাথায় নিয়েছ! যে আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে প্রগতির নারীগুলোর যাত্রা

হয়েছে সুরু—সে আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হ'বার সম্ভাবনাই যখন ভবিষ্যৎ পরিণতি—তখন মিথ্যে এত কষ্ট সহ্য করার ত' কোন প্রয়োজনই থা'কতে পারে না প্রতিমা।”

“না, তা' পারে না বটে! কিন্তু কে বলে আমার উদ্দম ভঙ্গুর! প্রগতিকে বাঁচিয়ে রাখাই যে নারীর একমাত্র স্বার্থকতা—তার কাছে বাকী স্বার্থগুলো সবইত' ভিত্তিহীন মানসদা'! তাই বলি—তোমার সাথে আমার মেলা-মেশা বন্ধ ক'রবার একমাত্র কারণ—শুধু লোকের কুৎসিৎ ধারণাই নয়। আমার নেতৃত্বে পরিচালিত নারী প্রগতিকে পুরুষের ছোঁয়াচ হ'তে দূরে রা'খতে—তা'কে বাঁচাতে—তা'কে সফলতার পথে এগিয়ে দিতে তাকে বিষাক্ত ক'রতে নয়, তাকে তার চলার পথে বাধা যোগাতে নয়।”

“তুমি যে একটা মস্ত বড় ভূল কর্‌ছ প্রতিমা। পুরুষের সহযোগিতাকে বাদ দিয়ে নারী ত' কোনদিনই দাঁড়াতে পারে না! নারীর শক্তি আর পুরুষের দক্ষতা, এ দু'টোর সম্বন্ধ যে বড় ঘনিষ্ট! একের বিরহে অপরকে যে কাতর হতেই হ'বে প্রতিমা! যেমন—পৃথিবীর প্রয়োজন মেটাতে সূর্য্যের দৈনন্দিন আগমন—তেমনি, নারীর সকল সফলতার মূলেও যে এই পুরুষ! ওই দু'য়ের মাঝে একের বিচ্ছেদে জগতের মঙ্গল কোথায়? প্রকৃতির প্রয়োজনে পুরুষের হ'ল সৃষ্টি—সে সৃষ্টি ত' ব্যর্থ হ'তে পারে না প্রতিমা! এদের মাঝে দু'জনেই যে দু'জনের পূজারী! তুমি আমি কালের গুণে হয় ত' বা স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে, জগৎ

মাঝে প্রচার করি—একের প্রয়োজন মেটাতে অন্যের ওপর নির্ভর ক'রবার আবশ্যক আমাদের নেই। কিন্তু—সত্যি কথা ব'লতে কি প্রতিমা, বাস্তবিকই কি তাই? শক্তি-ছাড়া শিব যেমন শব দেহ প্রায়, তেমনি তোমার আমার সহযোগিতা ছাড়া আমাদের শক্তি কোথায়? লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণ দেখেছ কখন?"

"তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ মানসদা'—এটা সেই গল্পকথা দৈবযুগ নয়, এটা যে একেবারে উলঙ্গ বিজ্ঞান-যুগ। এযুগে শিব-শক্তি, লক্ষ্মী নরায়ণ প্রভৃতির সমাবেশ ত' দূরের কথা, ওদের পাত্তা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। তাই ব'লছি—ও সব অহেতুক প্রসঙ্গে আর কাজ নেই। নারী প্রগতির নেত্রী হ'য়ে যুগোপযোগী আদব-কায়দাটুকু বজায় ত' আমাদের রা'খতেই হ'বে মানসদা।"

এমনিতর কত তর্ক-বিতর্কই না চ'লতে থাকে মানস আর প্রতিমার মাঝে দিনের পর-দিন ধ'রে। প্রতিমার আদর্শকে সফলকাম ক'রতে মানস নিল বিদায়।

* * * কোলকাতার বুক চিরে ছুটে যাওয়া ওই একঘেয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউর দীপালী বায়স্কোপটার সামনে, ওই তেতালার ফ্ল্যাট্‌টায় পাঁচ বছরের দুষ্টু খোকনটা কেবলই প্রতিমাকে কারণে অকারণে "মা মা" ব'লে ক্ষেপিয়ে তোলে। সে যেন "নাছড়-বান্দা!" ইচ্ছে থাক্ বা না থাক্—কোলে তাকে নিতেই হ'বে। খোকনের আকর্ষণে প্রতিমা আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। দিন দিন মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাকে উন্মাদ ক'রে তোলে। প্রতিমা হাজার চেষ্টাতেও সে বাসনার মূলোৎপাটন করতে পারে না। তার

সকল চেষ্টাই হয় ব্যর্থতায় পরিণত! আত্মপ্রবঞ্চনা মনের দুয়ারে হানে প্রচণ্ড আঘাত। ব্যথায় ভরে ওঠে তার বুক।

নেত্রীর পরিবর্ত্তন "তরুণী প্রগতির" চঞ্চল দৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রতে পারে না। তাই আজ তা'রা এ ওর গা টিপে আড়ালে মুচ্‌কি হাসতে আমোদ পায় বেশ একটু বেশী।

প্রতিমা যেন নেশার ঘোরে বিভোর! খোকনকে সবলে বুকের মাঝে চেপে ধ'রে—বুঝিবা বিফলেই সে তাকিয়ে থাকে নীল আকাশের পানে—ওই সুন্দর কলঙ্কিত চাঁদটার পানে। একে একে মনে পড়ে যায় অতীত কালের অতল তলে তলিয়ে যাওয়া কত ভবিষ্যতের কথা। সে ভাবে—আর কেউ জানুক না জানুক, সে ত' সবই জানে! ওইত' ওদের সহকর্ম্মী রেবা—যে রেবার কাছে অরুণের অদর্শন একেবারেই অসহ্য—তা' সে যতখানি গোপনীয়ই হোক্‌ না! মুখপুড়ি কোম্‌লী—সে ত' শ্যামল অন্তপ্রাণ! সুষমা—সে ত' একবারেই পতিপরায়ণা! এততেও ত' প্রগতির বাহ্যিক আড়ম্বরটুকু নষ্ট হয় নি! তবে সেই বা কেন শুধু্‌ শুধু্‌ মানসের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হ'বে—মাতৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেনই বা তা'কে পাগল ক'রে তু'লবে! এ হতে পারে না! না না, আত্মপ্রবঞ্চনার অভিনয় করে অনুশোচনার তীব্র কসাঘাত আর সে সহ্য ক'রবে না! নারীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ সে ক'রবেই—মাতৃত্বের দাবী তার অপ্রাপ্য নয়। এ দাবীতে তার অনিরুদ্ধ গতি। সে গতি রোধ ক'রবার শক্তি কা'রও নেই।

প্রতিমার চিন্তাস্রোতে ভেসে গেল কত কত বিনিদ্র রজনী।

একদিন সে আর স্থির থা'কতে পা'রল না। মনের মাঝে বয়ে চলেছে তার মাতাল-করা ফাগুন রাতের হাওয়া। তাই সেদিন সেই সন্ধ্যার সমাগমে মানসকে সে ফোন্ ক'রে ব'সল—কি যেন কি এক জরুরী কাজের আলোচনায় মানসকে তখুনি আ'সতে বাধ্য ক'রাবর মত অনুরোধ জানিয়ে।

অতীত দিনের ভু'লতে না পারা স্বাভাবিক অনুরোধ মানস এড়াতে পার্‌ল না। তাই—সে তখুনি তার মোটরখানা নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে হাজির হ'ল প্রতিমার বাড়ীতে। এক এক ক'রে সিঁড়ি কটাকে অতিক্রম ক'রে—মানস যখন ও-বাড়ীর ছাদে এসে হাজির হ'ল—আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদখানা আপন শোভায় সুশোভিত।

মানস দূর হ'তে ডা'কল, "প্রতিমা ?"

এ ডাকে প্রতিমা কিন্তু কোন সাড়া দিল না। যেমন পিছন ফিরে স্থির হ'য়ে আল্‌সের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনই রইল। এতে মানসের চঞ্চলতা আরও বেড়ে গেল। তাই সে একেবারে প্রতিমার সামনে গিয়ে হাজির হ'য়ে আরও বেশী উৎসুক ভাবে ডেকে ব'সল, "প্রতিমা ?"

প্রতিমা সচকিত হ'য়ে মানসের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক অপলক দৃষ্টে—তারপর হঠাৎ তার কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সদ্য-গাঁথা বেল ফুলের মালা গাছটা বা'র ক'রে পরিয়ে দিল মানসের গলায়—আঁচল দিয়ে ভক্তি ভরে' ঠু'কল এক মস্ত বড় প্রণাম।

মানস প্রতিমার কাণ্ড দেখে জ্ঞান-বুদ্ধি সব এক সঙ্গে হারিয়ে ব'সল। তাই ঠিক একটা কাঠের পুতুলেরই মত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দে'খতে লাগল সম্পূর্ণ অজানিত ভাবে আবির্ভূত হওয়া যত কিছু কার্য্য-কলাপগুলো।

প্রতিমা প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়ায়—খুট্ করে একটা শব্দ ক'রে সদ্য কেনা সিঁদুর ভরা কৌটটা খুলে তুলে ধরে' মানসের সামনে।

মানসকে কে যেন যাদু করেছে। তাই প্রতিমার ইঙ্গিতে মানস স্বহস্তে এঁকে দিল সিঁদুরের রেখা প্রতিমার সিঁথির উপরে—তার মুছ্‌তে না চাওয়া অতি পুরাণো কুমারী নামটা ঘুচিয়ে দিতে।

* * * হঠাৎ যেন মানস চমক্ পেল। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "এ আমি কি ক'রলাম প্রতিমা?"

এর উত্তরে প্রতিমা মুখে স্বস্তির হাসি ফুটিয়ে তুলে বলে, "নাগো মশাই না। অন্যায় তুমি কিছুই করনি। প্রকৃতির প্রয়োজনে পুরুষের হ'ল সৃষ্টি। আর সেই সৃষ্টির নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনে হ'ল আজ তোমার আমার শুভদৃষ্টি।"

"কিন্তু তোমার তরুণী-প্রগতি?"

"তুমি আমায় অপমান করছ? তুমি কি বলতে চাও— নারী প্রগতি একটা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়?"

"না প্রতিমা—অপমান তোমায় আমি করিনি। আর ওটা যে একটা ভণ্ডামী—এ কথাও আমি বলছি না। তবে—"

"তবে ?"

"তবে কি জান প্রতিমা ! আজকালকার তোমাদের যে সমস্ত প্রগতি, সেগুলো মেয়েদের যে একটা নিছক গোঁয়ারতুমি ছাড়া আর কিছুই নয় – বর্ত্তমানে এইটাই হচ্ছে আমার বদ্ধমূল ধারণা।"

"তোমার ধারণা ত' ভুলও হ'তে পারে ?"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার ব্যাকুল আহ্বানে আমাকে প্রায় এক রকম আকুল ভাবেই ছুটে আ'সতে হয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এককাপ্ চা'ও কি তুমি খাওয়াবে না প্রতিমা ?"

"আমার পিপাসা মেটাতে তোমায় পড়েছে ডাক। কিন্তু তুমিও যে তৃষ্ণাতুর—একথা ত' আমার জানা ছিল না। আচ্ছা —সে যাই হোক্—আপাততঃ চল যাই আমরা ওই টিফিন—রুমটার দিকে। ভুল বোঝা-বুঝির পালা শেষ করে আজ আমরা দু'জনে এগিয়ে যাব উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়া নগ্ন রাস্তা গুলোর ওপর দিয়ে—একান্ত উৎফুল্ল হৃদয়ে। আজ বড় আনন্দের দিন। তাই আজ কেবলই আমার মনে হচ্ছে— আচ্ছা বলত'—নতুন ক'রে যে যাত্রা আমাদের হ'ল সুরু— সে যাত্রা জয়যুক্ত হ'বে কি না ? যত কিছু ভুল-ভ্রান্তি, যত কিছু অন্যায় এসে বেঁধেছিল বাসা আমাদের মনের গহন কোনে, তা' সবই আজ যখন বিতাড়িত—তখন আর ভাবনা কিসের ?

সুখের আতিশয্যে প্রতিমার মুখ হ'তে বেরিয়ে আসা আবিলতায় ভরা কথা গুলোর কোন উত্তর খুঁজে পায় না মানস।

কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে সে খুবই আগ্রহান্বিত হ'য়ে পড়ে—তাই সে প্রতিমার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধ'রে বুলিয়ে চলে আপন হাতটা—বিরহিণী প্রতিমার কোঁকড়া-চুলে শোভা-পাওয়া মাথাটায়।

জ্যোৎস্নায় ফেটে পড়া রাত। কোন সুদূরে, কি জানি কি ভেবে পাপিয়াটা হঠাৎ ডেকে ওঠে, "চোখ গেল—চোখ গেল।"

পাখীর ডাকে চমক্ পাওয়া প্রতিমা ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা এঁকে মানসের দিকে তুলে ধরে তার মায়ায় ভরা কাজল পরা ডাগর দুটি চোখ। তা' দেখে মানস হারিয়ে ফেলে তা'র মুখের ভাষা, শুধু ধীরে ধীরে টেনে দেয় প্রতিমার মাথায় অতীত হ'তে আজ পর্য্যন্ত "ঘোমটা" নামে পরিচিত আঁচলের অংশটা।

জ্যোৎস্নার আলোকে দাঁড়িয়ে থাকে ওই দুটি তরুণ-তরুণী। কা'র মুখে কোন কথা নেই। শুধু নির্ব্বাক নিস্পন্দে দু'জনেই দু'জনের দিকে চোখে চোখে থাকে চেয়ে। উভয়ে উভয়কে জানায় দোঁহার অন্তরের যত বাণী। পাশের বাড়ীর রেডিওটায় তখনও কে যেন গেয়ে চলেছে—সেদিনের সেই আজও পুরাণো না হওয়া—আজও শুনতে ভাললাগা—সেই গানটা—সেই,

"বাঙ্গলার বধূ—বুকে তার মধু,—নয়নে নীরব ভাষা।
কত সীতা-সতী পরাণে তাহার,—গোপনে বেঁধেছে বাসা॥"

ভগ্নদূত—১৮ই আগষ্ট—১৯৫৪

নয় অভিনয়

রমেন সেদিন রূপবাণী সিনেমার সামনের ওই ফুটপাতটার ওপর লাইট-পোষ্টটায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন কি একমনে ভেবে চলেছে। সবে মাত্র বায়স্কোপের ম্যাটিনী-শো-টা ভেঙ্গে গেছে। তাই ছেলেমেয়ে দর্শকের ভীড় ক্রমশঃ বাইরে এসে ভীড় জমাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা আর ট্যাক্সিতে ভরে উঠেছে সারা রাস্তাটা।

রমেনের নজরে পড়ে—রঙিন্ আবরণে ঢাকা বাঙ্গলার মা-বোনের দলগুলো। কা'র মাথায় এতটুকু ঘোমটা, আবার কা'র বা তাও নেই! কা'র পায়ে পাতলা তু'খানা শ্লিপার—আবার কা'র বা দস্তুর মত হিল্ তোলা। চোখে কাজল, আর ঠোঁটে আলতা, হেস্‌লিঙ-পাউডারের সমাবেশ আর সুচিত্রিত টিপের বাহার, এ যেন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাতে কোন্ রম্ভা-উর্ব্বশীর মন মাতান সাজ-সজ্জা।

সিঁথিতে সিঁদুর চিহ্ন—তাও আবার না থাকারই সামিল, যে চিহ্নটা এককালে ছিল নাকি পরম গৌরবের। সে একদিন ছিল—যেদিন টুকটুকে তু'খানা পা দেখলে কেউ ও-তু'খানা স্পর্শ ক'রবার লোভ সামলাতে পা'রত না—আর এই একদিন, এদিনে নাকি সেই পায়ের দিকে নজর দিতে রমেনেরই মনে আঘাতের শিহরণ জা'গল! যে কালে ঐ সমস্ত মা-বোনের চোখ হ'তে

মায়ায়-ভরা-দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হ'ত, আর আজ নাকি তাও নিষ্প্রভ। চশমার সাহায্য বিনা সে চোখের দৃষ্টি নাকি অদূর গতি সম্পন্ন। এর জন্যে দায়ী নাকি বিদ্যার তীব্র সাধনা। তাই রমেন মনে মনে ভাবে, সে সাধনার ফল আজ এত বিষাক্ত কেন! অতীতের ভালটুকু বর্ত্তমান মেনে নিতে চায় না কেন!

ওই যে মা-বোনের দল—ওরাই ত' সেই চলে যাওয়া-যুগের রিজিয়া, চাঁদ সুল্‌তানা, অহল্যাবাঈ-এরই বংশসূত্র। তবে কেন ওরা আজ এত জীর্ণ, আর কেনই বা এত ক্ষীণজীবি। ওদেরই সন্তান-সন্ততিরা ত' সেই শিবাজী, রাণা প্রতাপেরই বংশধর! তবে কেন তারা আজ এত ভীত-ত্রস্থ!

বর্ত্তমান আর অতীতের আবিলতায় ভরা হাজার হাজার জটিল সমস্যাগুলো সব এক সঙ্গে রমেনের মনের মাঝে এসে হাজির হ'ল। সে আর স্থির থা'কতে পারে না। তাই বাড়ীমুখ চালিয়ে দিল আপন পা'দু'খানা, নানান্ সমস্যার সমাধান-চিন্তার পাষাণ চাপ মাথায় নিয়ে। সে ভাবে, "হায়রে প্রকৃতি! এ আবার তোর কোন্ অভিনব সৃষ্টি! জগত মাঝে যেদিকেই তাকাও, কেবলই একঘেয়ে সেই একই অভিনয়ের পূর্ণ মহড়া! বাস্তবের কোন চিহ্নই কি সেখানে নেই! জনক-জননী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী সবাই ঐ একই ভঙ্গিতে—একের পর এক ক'রে কাটিয়ে চলেছে শেষ না হওয়া জীবন-নাটকের অফুরন্ত দৃশ্যগুলো! হায় বিধাতা! এখন কি তুমি ব'লবে বন্ধু, "নয় রে নয়—এ অভিনয় নয়?"

রমেন ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে পৌঁছায়। আপন ভোলা ভোলানাথেরই মত সে তার বাইরের ঘরের টেবিলের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে' বিজলী বাতীর বোতামটা টিপে দিয়ে।

সে আনমনে চেয়ে থাকে খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে সামনে—ওই বাহিরের পানে, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে।

নিপুণ হাতের পরশ পেয়ে সাম্নে বাড়ীর জানালার ওই কপাট দু'টো আস্তে আস্তে গেল খুলে—খুট্ খুট্ দু'টী শব্দ ক'রে। রমেন চাইল তার পানে—সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রঙের প্রভায় প্রভাময়ী ওই প্রভার পানে। প্রভার অভিসার আহ্বানে রমেনের মন উঠ্‌ল বিষিয়ে, আপন ঠোঁটে ফুটে উঠ্‌ল বিদ্রূপ-মাখান হাসির ছটা।

ফুলহার ভ্রমে কাল-ভুজঙ্গেরই মত প্রভা বুঝ্‌ল ভুল। ভাবল সে—বুঝিবা জয় করেছে সে সেই অজেয় রমেনকে—আজকের এই অভিনব সজ্জার সাহায্যে। তাই সেদিনের সেই প্রথম ওঠা সূর্য্যিটাকে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় নির্ভিক চিত্তে ডা'কল, "রমেন দা" ?

প্রভার মুখের ভেসে আসা কথা রমেনকে সজাগ ক'রল। সে আবার চাইল সামনের পানে। নজরে প'ড়ল জানালা হ'তে বেরিয়ে আসা প্রভার ডান হাতখানা। হাতের মাঝে রয়েছে বুঝিবা একখানা খামে-ভরা চিঠি। তা' দেখে রমেন উঠে এগিয়ে গিয়ে প্রভার হাত হ'তে নিতে গেল চিঠিখানা —বুঝিবা অজানা কোন এক প্রেরণায় বসে।

চিঠিটাকে কেন্দ্র ক'রে, জানালার লোহার গরাদের ব্যবধানকে তুচ্ছ করে, সেদিনের সেই রাত্রে বুঝিবা সে কোন এক অজানা লগ্নে দু'টী তরুণ-তরুণী হাতে হাতে পেল ছোঁয়াচ। তা' দেখে ওতপ্রত হয়ে বসে থাকা শিকারী ওই কালো বেড়ালটা আনন্দে কি নিরানন্দে, আশায় কি নিরাশায়, সুখে কি দুঃখে কে জানে—হাঠাৎ ডেকে উঠ্‌ল—তা'র সেই মামুলী ভাষায়—যে ভাষার অর্থ এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান যুগেও লোকে আবিষ্কার ক'রতে পারে নি, যে ভাষা শ্রবণে মানুষ আজও মনের মাঝে কোন অনুভূতি পায়নি, সেই ভাষায়—সেই সুরে—সেই একই ভঙ্গিতে ডেকে উঠ্‌ল, "ম্যা-ও" ক'রে। রমেন চিঠি নিতে হাত বাড়াল—প্রভা, ছলনাময়ী ললনা প্রভা—চিঠি দেবার ভঙ্গির মাঝে চেপে ধর্‌ল রমেনের হাতখানা—নিজেরই হাতের মাঝে।

নারীর প্রথম পরশে রমেনের সারা অঙ্গে শিহরণ জাগল। অনাগত কি যেন কোন্ বিপদের আশঙ্কায় তার বুকখানা ক্রমাগত কেঁপে চল্‌ল। জিভ্‌টা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। সে চাইল অনেক কিছু বল্‌তে, কিন্তু মনের মাঝে বুকের ভাষার ঘটল অকাল মৃত্যু, তাই বলা আর হ'ল না। এই মৌনতার মাঝে প্রভা বুঝ্‌ল ভুল। সে ভাবল, "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।" তাই মনে মনে আপন কার্য্যসিদ্ধির সফলতার আল্‌পনা এঁকে, রমেনের হাতটা দিল ছেড়ে, বুঝিবা তা'কে খামে-ভরা চিঠিখানা প'ড়বার সুযোগ দিতে।

রমেন প'ড়তে থাকে। "বল্‌তে পার রমেনদা"—আমার

আসা যাওয়ার পথের মাঝে কার দীপালি জ্বলে ? হয় ত' জান —হয় ত' বা জেনেও তুমি ব'লবে না—বা স্বীকার ক'রবে না। যাক্ সে কথা। কতদিন কত ভাবে তোমাকে আমি আমার বুকের ভাষা, জীবনের সাধনা, অন্তরের পিপাসা, নারীর কামনা —কত ছন্দে, জীবনের প্রতিটী ধারায় ধারায় জানিয়ে এসেছি। কিন্তু সবই বৃথা। তুমি আমার দিকে মুখ তুলেও কোন দিন চাওনি। জানি না এ তোমার অহঙ্কার কি না! প্রকৃতিকে তুচ্ছ ক'রে পুরুষ কোন দিনই বড় হ'তে পারে নি—হয় ত' বা এটা তোমার অজানা নয়। সৃষ্টির মাঝে নিত্যি-নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন বলে যে দুটোর (প্রকৃতি আর পুরুষ) সৃষ্টি হয়েছে, সে দু'টোকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই তা' আমি জানি। এই যে "শিব সেজে পার্ব্বতীর তপস্বা নেওয়া"— আজকের যুগে এ তোমার অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয় রমেনদা'। তাই লিখ্ছি—লিখ্ছি নয়-বল্ছি—আমার এই বাসনার সমাধি তোমায় আমি দিতে দেব না। তা'ছাড়া এতখানি নিষ্ঠুর তুমি কোনদিনই হ'তে পার্বে না তা' আমি জানি। দেবতার পায়ে শোভা পাওয়া ফুল—তা' যার শোভায় যেই শোভান্বিত হোক্ না কেন, জগত মাঝে উভয়েই যেমন সমান আদর পেয়ে ও দিয়ে এসেছে, তেমনি আমার মনে হয় —যৌবনের ছোঁয়াচ পেয়ে—যে কুঁড়িটা একটু একটু ক'রে দিনের পর দিন ধরে ফুটে উঠে তোমার পায়ে ঝড়ে প'ড়বার শুভ মুহূর্ত্তটুকুর প্রতিক্ষায় রত, তা'র সেই শেষের পরিণামটা

জগত মাঝে অশোভনীয় কোন দিনই হ'তে পার্বে না। আমার মনের সব কিছু বাসনাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে শেষের দিনের পম্পাই'এর মত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে তুমি দেবে না বলেই আমার বিশ্বাস। জানি না রমেনদা, আমার এই আবেগ-ভরা প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটুকু তোমায় বিচলিত কর্বে কিনা।

ইতি—তোমার—"প্রভা"

রমেন বার বার ক'রে চিঠিখানা প'ড়তে লাগল। যত বারই সে চিঠি প'ড়তে লাগলো—ততবারই তা'র মনে হ'ল, "ছি—ছি—! ভাবতেও ঘৃণা হয়! জগত মাঝে এমনিভাবে নারীর গর্ব্ব, মান, মর্য্যাদাটুকু খর্ব্ব কর্বার বদ্‌খেয়ালটুকু নারীর মনে এলো কোথা হ'তে! এরাও ত' সেই দেশেরই মেয়ে যে দেশে জন্মেছিল একদিন নারীর আদর্শ সেই জনক-নন্দিনী সীতা, কৃষ্ণ-সখী দ্রোপদী, সত্যবান-অঙ্কশায়িনী সাবিত্রী—যাঁরা জগত মাঝে আজও, এই বিংশতি যুগেও পূজণীয়া-আদর্শণীয়া-স্মরণীয়া।"

এমনি তর কত কিই-না রমেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। হঠাৎ প্রভার ডাকে চমক্ পেয়ে আবার সে সুমুখ পানে ফিরে চাইল। প্রভা জিজ্ঞেস ক'রল—"রমেনদা'! একটা কিছু উত্তরও কি তুমি দেবেনা?"

এর উত্তরে রমেন একটু ম্লান হাসি হেসে ব'লে বস্‌ল—"শোন প্রভা! তোমাদের সম্বন্ধে ধারণাটা আমার অনেক উঁচুই ছিল এবং এখনও যে না আছে তা' নয়। আমি চাই নারীর মান রক্ষা ক'রে চল্‌তে। ক্ষণিক উত্তেজনার বসে

বা আপাতঃ-মধুর প্রলোভনে ভুলে যে প্রস্তাব তুমি আজ আমার কাছে কর্‌লে. তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই আমার বর্ত্তমান অভিপ্রায়। সে বিদ্রোহের উদ্দেশ্য তোমাকে আঘাত দেওয়া নয় প্রভা, এর উদ্দেশ্য তোমাদের মত চপলা-চঞ্চলাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আন্‌তে আন্তরিক সাহায্য করা। আঘাত তুমি পেওনা, দুঃখিতা তুমি হ'ও না। তা'র চেয়ে এসে দাঁড়াও প্রভা তোমার রমেনদা'র পাশে ঠিক্ তা'র ছোট বোন্‌টির মত স্নেহের দাবী নিয়ে। তোমার সাহায্যে, শক্তিরূপা নারীর সাহায্যে পুরুষ আবার মানুষ হোক্। মাটীর পৃথিবীতে —দরিদ্রের কুটীরে—ধনীর দুয়ারে আবার একে একে জন্ম নিক্ সেই সীতা, সেই সতী, সেই সাবিত্রী। অভিনয় ভুলে গিয়ে, এস সবে মিলে আবার সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। বাস্তব আবার প্রকৃত বাস্তবে হোক পরিণত।" রমেনের কথায় প্রভা চম্‌কে ওঠে। সে বলে, "না রমেনদা' না—এ অভিনয় নয়। ভুল তুমি বুঝনা। আমি তা' ক'রতে পা'রব না। যে আসনে তোমায় আমি বসিয়েছি, সেখান হ'তে নামিয়ে আনা, নারীর কাছে অতখানি সহজ কথা নয়।

এ কথায় রমেন উত্তর দেয়, "তোমার সাথে একমত হ'তে পার্‌লুম না প্রভা। আমার জীবনের লক্ষ্য তোমা হ'তে ভিন্ন। তাই গতিও তার স্বতন্ত্র। সুতরাং বিদায় আমায় নিতেই হ'ল।"

নওরোজ—চৈত্র—১৩৫১

নিশিথ-হেনা

“যান্ নিশিদা’—এবার আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন্!” এই ব’লে হেনা নিশিথের হাত হ’তে পাখাটা কেড়ে নিতে যায়।

নিশিথ, হেনার দাদা রুগ্ন-সসীমের মাথায় ক্রমাগত্ পাখা চালিয়ে যায়। হেনার পরশে তার প্রাণের মাঝে জাগে শিহরণ। সে একটু হেসে উত্তর দেয়, “না—হেনা—না। ক্লান্ত আমি এখন হইনি। তা’ছাড়া, তুমি এই সেদিন মাত্র টাই-ফয়েড্ থেকে উঠেছ—এখনি তোমার হাতে পাখাখানা অম্লান বদনে তুলে দিতে আমি পা’রব না। আমার অনুরোধ রাখ—লক্ষ্মীটি! রাত জেগে আবার রোগকে ডেকে তুমি এননা।” হেনা আর কথা কয় না। সে আস্তে আস্তে চলে যেতে যায়। নিশিথ পিছন হতে হেনার লুটিয়ে-পড়া-কোঁকড়া-চুলের শেষ গুচ্ছটা ধরে’ ঈষৎ জোরে টান দেয়। হেনার গতির পথে পড়ে বাধা, তাই সে পিছন পানে ফিরে চায়—নিশিথের সাথে হয় দৃষ্টি বিনিময়—উভয়ের মুখে ফুটে ওঠে ছিট্‌কে আসা একটুক্‌রো মিষ্টি হাসি।

সসীম দারুণ নিউমোনিয়ায় অচেতন হ’য়ে পড়ে থাকে। বাইরের খবর রাখবার কোন শক্তিই তা’র নেই। হয় ত’ বা মনের মাঝে নিয়তই সে মেপে চলেছে বারে বারে ভুল-করা এপার-ওপারের মাঝের পথটুকু! রোগের জ্বালায় প্রাণের যাতনাটুকু ব্যক্ত ক’রবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তার নেই। কখন

কাঁদে, আবার কখন বা ব'লে চলে' অর্থহীন, সূত্রহীন্ টুক্‌রো টুক্‌রো কথার রাশি। সে কথার মাঝে কোন প্রশ্ন নেই, উত্তর নেই, আছে কেবল আবিলতা। নিশিথ সারানিশি ধরে' পাখা চালায়, ঔষুধ খাওয়ায়—টেম্‌পারেচার নেয়। মাঝে মাঝে হেনা এসে মত্ততা সুরু ক'রে। নিশিথ তা'কে ফিরিয়ে দেয়—তা'র চলে-যাওয়া পথের মাঝে হঠাৎ টেনে বসে চুলের রাশি—লুটিয়ে পড়া আঁচলের খুঁট্‌টা।

পাড়ার লোকে বলা-বলি করে, "সসীম যদি কোনদিন সেরে ওঠে, তা'হলে বু'ঝবে এ শুধু নিশিথবাবুরই নিঃস্বার্থ সেবা যত্নের ফলে। নিশিথবাবুর মত ছেলে নাকি খুব কমই দেখা যায়। এ রকম বন্ধু-প্রীতি তাঁরা জীবনে কোনদিন দেখেনও নি।"

লোকের মুখে নিশিথের নিঃস্বার্থতার ব্যাখ্যা শুনে নিশিথ মনে মনে না হেসে কোনদিনই থা'কতে পারে নি। তাই সে মনে প্রাণে অনুভব ক'রে লোকের মুখের কথার ওজনটুকু! এই কথারই ওপর নির্ভর ক'রে—লোকে হাসে, কাঁদে, মরে-বাঁচে, আরও কত কি!. অথচ—বাস্তবিক বিচার ক'রে দেখলে সে কথার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না—মূল্য ত' দূরের কথা। এ নাকি চির রহস্যে ভরা—এ নাকি শাশ্বত জীবনের মাঝে প্রহেলিকাময় রং-বেরঙের রঙ্গমঞ্চের মনভোলান অভিনয়।

আকাশে ফুটে ওঠে দ্বিতীয়ার চাঁদ! ফাগুন রাতের মাতাল করা চাঁদের আলোয় দূর বনে নাম-হারা পাখী গায় গান—শীতল-স্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে আসে মহুয়া-সুবাস!

চঞ্চলা-হরিণীর মত ছুটে আসে হেনা নিশিথের পাশে, কি যেন কি বল্‌তে। লজ্জায় বাধা পায় তা'র বুকের ভাষা। বলা আর হয় না। শুধু মনের মাঝে গুণ-গুণিয়ে চলে'—

"আমি—আমি রে—

মহুয়া বনের পাখী।"

চতুর নিশিথ সব বুঝতে পারে। তাই হেনাকে পাশে বসিয়ে, তা'র হাতে পাখাটা তুলে দিয়ে বলে, "বুঝেছি হেনা। তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রতে পার না, তাই বারে বারে ছুটে এস দাদাকে সেবা ক'রতে।" এই বলে নিশিথ মনে মনে হাসে।

হেনার প্রাণে লাগে আঘাত। তাই হঠাৎ ছল্ ছল্ জলভরা চোখ দু'টো নিয়ে নিশিথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "না নিশিদা' এ আপনি ভুল বল্‌ছেন। আমি ছুটে আসি আপনার উপর অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে নয়—আমি ছুটে আসি আপনার পরিশ্রমের লাঘব ক'রবার আগ্রহ নিয়ে।"

কিন্তু তবু কেন জানি না—নিশিথের মনে জাগে পুণরাঘাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাই সে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে বলে, "মুখের কথায় অন্তরের ভাষাকে চাপা দেওয়া রোগ একদিন আমারও ছিল। বর্ত্তমানে সে রোগটা থেকে মুক্ত হয়েও ও চাতুরীটুকু ধ'রে ফেল্‌বার শক্তিটুকু এখন আমি হারিয়ে ফেলিনি হেনা।"

হেনা এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তাই সে জল-ভরা ডাগর দু'টী আঁখি নিবদ্ধ রাখে খানিক নিশিথের পানে। টপ টপ ক'রে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু

শুক্‌নো ওই পাখাটার 'পরে। তারপর হঠাৎ সে উঠে প'ড়ে পা চালিয়ে দেয় সাম্‌নের ওই জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া ছাদ্‌টার পানে। মনে মনে বল্‌তে থাকে—"হায়রে! যে বধীর তাকে আমি কেমন ক'রে শোনাব আমার বুকের ভাষা!"

নিশিথ সব বোঝে। তাই মনে মনে একটু হেসে নিয়ে তাকিয়ে থাকে হেনার চলে-যাওয়া পথের পানে। তারপর সে আস্তে আস্তে উঠে চলে যায় ছাদে—চেতনাহীন সসীমকে একলা ফেলে রেখে।

হেনা ছাদের আল্‌সেটায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীল আকাশের ওই সাদা চাঁদটার পানে চেয়ে। ফাগুনের ফুরফুরে বাতাসে কয়েক গাছা কোঁক্‌ড়া এলোচুল তা'র কপালে এসে প'ড়ে শির্ শির্ ক'রে কাঁপতে থাকে।

যৌবন প্রাপ্তা হেনা—শুভ্র জ্যোৎস্নায় তা'কে আজ কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। নিশিথ দূরে দাঁড়িয়ে খানিক হেনার ঐ রূপসুধা পান করে। তারপর আস্তে আস্তে হেনার পাশে এগিয়ে গিয়ে তার ক্ষুদ্র হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে চাপা গলায় ডাকে, "হেনা?"

হেনা কোন কথা কয় না। সে তা'র কাজলপরা দু'টী আঁখি তুলে ধরে নিশিথের মুখের পানে—নীরবে চোখ হ'তে গড়িয়ে আসে শুধু দু'ফোঁটা অশ্রু, নিটোল তা'র গোলাপী গাল দু'টী বয়ে। জ্যোৎস্নালোকে তা' দেখে হীরক খণ্ড বলে হয় ভ্রম!

নিশিথ আবার ডাকে, "হেনা?"

হেনা লজ্জায় মাথাটা নিচু ক'রে মৃদুস্বরে উত্তর দেয়, "বলুন নিশিদা' ?"

নিশিথ হেনার মাথাটা নিজের বুকের মাঝে চেপে ধ'রে ডেকে চলে, "হেনা—হেনা—হেনা।"

হেনার মুখের ভাষা যায় ফুরিয়ে—আবেশে বুজে আসে চোখ—পুলকে দুরু দুরু কেঁপে চলে হিয়া।

অনেকক্ষণ এভাবে কেটে যায়। হেনা চায় নিশিথের পানে—নিশিথ এঁকে চলে চুম্বনের পর চুম্বন রেখা হেনার নিটোল কপোলে—একের পর এক ক'রে। তার জ্বালায় অস্থির হেনা একটু দুষ্টু হেসে বলে, "এবার আমি যাই নিশিদা, রাত জেগে রোগকে ডেকে আনা উচিত নয়—কি বল ?"

নিশিথ একটু হেসে জবাব দেয়, "তাই যাও রাণী।"

এর উত্তরে হেনা হঠাৎ কৃত্রিম আশ্চর্য্যের ভনিতা করে, বড় বড় চোখ দু'টী নিশিথের মুখের পানে তুলে ধ'রে, গালে একটা আঙ্গুলের পরশ হেনে বলে, "ওমা ! রাণী আবার কবে হলুম্।"

উত্তরে নিশিথ বলে, "ঠিক সেইদিন থেকে হেনা, যেদিন আমি মনের মাঝে কুড়িয়ে পেলুম্ তোমায়।"

হেনা কোন কথা খুঁজে পায় না। তাই খানিক পরে কি যেন কি ভেবে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "নিশিথের হেনা, দিনের আলোয় যখন ঝ'ড়ে প'ড়বে গাছ হ'তে, তখন নিশিথেরই মুখ চাওয়া এই হেনার কি অবস্থা হ'বে ? তখন কি তুমি ভুলেও ফিরে চাইবে নিশিদা' ?"

জবাবে নিশিথ বলে, "তুমি যে ভুল করছ হেনা। রাতের বিরহে, দিনের আলোয় হেনার হয় ত' মৃত্যু ঘটে সত্য, কিন্তু তার আত্মার ধ্বংস ত' কোনদিনই হয় না। তাই সেই আত্মা নিশিথের পুনরাগমন বার্ত্তা শুনে—নবপ্রেরণায় নিত্য-নূতন জীবন নিয়ে প্রবেশ ক'রে ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির মাঝে। তাই ত' নিত্য-নূতন নিশির বুকে হেনার ভাঙ্গে ঘুম। নিশির চোখের বাইরে ঘটে হেনার দেহের মৃত্যু—তাই কিছুই না-জানা নিশি, সকল পাওয়ার মাঝে হারায় সব হারানর ব্যথা।"

নিশিথের কথায় হেনার মুখে ফুটে ওঠে শান্তি-পাওয়ার রেখা। তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে তার চোখ। নিশিথেরই কোলে এলিয়ে পড়ে তার সর্ব্ব শরীর। তাই নিশিথ তাকে কোলে ক'রে বিছানায় দিয়ে আসে শুইয়ে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল তা'র অতি ক্ষুদ্র পল-বিপলের সমষ্টিগুলো নিয়ে। ডক্তারের চিকিৎসায়, নিশিথের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নিজের পরমায়ু নিয়ে সসীম ওঠে সেরে। দুই বন্ধুতে ছোট ছোট ফুল গাছে ঘেরা ঐ শাঁন্ বাঁধন বেঞ্চটায় ব'সে কত কথাই না কয়।

সসীম বলে, "হেনা বড় হয়েছে। এখন তা'র বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এক জায়গায় কথাবার্ত্তাও চ'লছে। কিন্তু ছেলেটা আমার বেশ পছন্দ হচ্ছে না, তাই ভদ্রলোককে পাকা কথা আমি দিতে পাচ্ছি না। অথচ বিয়েটা শীগ্‌গীর দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। দেখি, শেষ পর্য্যন্ত একান্ত নিরূপায় হ'লে—ওই

ছেলের সঙ্গেই হেনার বিয়ে দিতে হ'বে। তাই বলছি—তোমার সন্ধানে কোন ভাল পাত্র-টাত্র আছে নাকি?"

সসীমের কথায় নিশিথের বুকের মাঝে জাগে গভীর স্পন্দন। সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, "এত ব্যস্ত কেন বন্ধু! হেনার এমন কিছু বয়েস হয়নি—যার জন্যে তোমার এত চিন্তা। আজকালকার তুলনায় ও ত' অতি শিশু।"

সসীম নিশিথের মনের কথা বুঝ্তে পারে। তাই মনে মনে একটু হেসে নিয়ে প্রকাশ্যে বলে, "আজকালকার তুলনায় বয়েসে হেনা অতি শিশু হ'তে পারে নিশিথ—কিন্তু ওই আজ-কাল্কারই আবহাওয়ায় হেনার মত অনেক শিশুর মনেই বইতে শুরু করেছে আর একজনের সঙ্গ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নেশা। অল্প বয়েসে মা-বাপ্ হারান আমার ছোট বোন্ হেনা। তা'র চাওয়ার আগেই তা'কে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়াই আমার প্রথম কর্ত্তব্য ভাই। তাই ত' তা'র জন্যে আজ আমার এত ব্যস্ততা নিশিথ!"

নিশিথ একটু চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রে ব'লে বসে, "হেনা কি এরই মধ্যে কারও প্রতি অনুরক্ত?"

এ কথা শুনে সসীম হো হো ক'রে ওঠে হেসে। তারপর হাসির বেগ্টা সম্ভবমত সংযত ক'রে বলে, "না—নিশি—না। এতখানি দুঃসাহস তা'র এখন হয়নি। তা'ছাড়া এত বড় সুযোগ আমি তা'কে কোনদিন দেবও না।" তারপর একটু গম্ভীর হ'য়ে ব'লে, "আমার পছন্দই তা'র পছন্দ, আমার দেওয়াই

তা'র চরম প্রাপ্তি। এর মধ্যে রক্ত-অনুরক্তের কোন প্রশ্ন থাকতে পারেনা।"

নিশিথ আর কোন কথা বলে না। সে শুধু একবার সসীমের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নেয়। সে চাহনীর মাঝে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু তা' চতুর সসীমের কাছে গোপন মোটেই ছিল না। তাই সসীম আড়ালে একটু হেসে নিয়ে, গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে হঠাৎ নিশিথের হাত দুটো চেপে ধ'রে বলে, "আমার অনুরোধ—হেনার জন্যে সৎপাত্র তোমায় খুঁজে দিতেই হবে ভাই!"

নিশিথ শুক্‌নো গলায় জবাব দেয়, "আচ্ছা, খুঁজে দে'খব।"

নিশিথ হোষ্টেলে ফিরে আসে। রাতে তা'র ঘুম আসে না —হেনার জন্যে কেবলই তা'র প্রাণটা কেঁদে ওঠে। সেদিনের সেই জ্যোৎস্না রাতের কথা মনে পড়ে। সেই হেনা—সেই তা'র কাঁপন-লাগা পরশ, সেই তা'র লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠা কপোল—সেই তা'র কাজল-পরা ডাগর দু'টী চোখ! একে একে অতীতের সব ক'টা ছবিই নিশিথের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। সে ছবি যেন আর মেলাতে চায় না! কিন্তু হায়! হেনা—নিশিথেরই বুকে ফুটে ওঠা সেই হেনা! আজ নাকি সে চলেছে—না চেনা, না জানা সে কোন নূতনের গলায় মালা পরিয়ে দিতে; তার সঙ্গিহীন জীবনের চিরসঙ্গী মিলিয়ে নিতে!

হেনা কি ভুলে যাবে তার জীবনের সব কিছু অতীত-কাহিনী? হয়ত' বা যাবে! অদ্ভুত নারী-চরিত্র! যৌবনের

উশৃঙ্খলতাকে চাপা দিয়ে সেই হয়ত' বা প্রমাণিত হ'বে একদিন চরিত্রে সতী, সাবিত্রী কিম্বা সীতা সমতুল্য ! গর্ব্বে ফুলে উঠবে তার বুক—উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠবে তার সিঁথির সিঁদুর! হয় ত' বা কত নিশি সে শুধু জেগে বসে রবে তার স্বামীর আগমণ পথ পানে চেয়ে! আর নিশিথ! হয় ত' বা তা'র জীবনের সব ক'টা নিশি-ই একে একে কাটিয়ে যাবে শুধু স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝে—হেনার যত কিছু ভুল্‌তে না-পারা অতীত স্মৃতিগুলো নিয়ে!

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে নিশিথ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্গে পিয়নের ডাকে। পিয়ন তা'র হাতে দেয় একখানা টেলিগ্রাম্। নিশিথ টেলিগ্রাম্ পেয়ে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ওটা পড়তে থাকে, "Mother hopeless, come sharp. Tunu"

দুনিয়ার মাঝে তার মা-ই তা'র কাছে একমাত্র প্রিয়জন। সেই মা'ই কি তাকে চিরতরে ছেড়ে যেতে চায়! তাই নিশিথ আর কালবিলম্ব না ক'রে, দরকার মত দু'একখানা কাপড়-জামা নিয়ে সুটকেশ হাতে বেরিয়ে পড়ে পলাশপুরের উদ্দেশ্যে।

সুয্যি তখন প্রায় ডুবু ডুবু। নিশিথ তাদের বাড়ী ঢুকতে গিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়! মাথার উপরে নহবতে সানাইটা বারে বারে একই সুরে গেয়ে চলে, "তাই হৃদয় আমার হল্ স্বয়ম্বরা।" গান শুনে নিশিথের মনে পড়ে যায়, 'গরমিলের সেই মালতীর" কথা! মনের মাঝে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়—প্রশ্ন জাগে—"তবে কি মালতীর সাথে হেনার জীবন-ধারাও একই সূত্রে গাঁথা?"

প্রশ্নের মাঝে সে উত্তর খুঁজে পায় না। তাই সন্দেহ—আবার জোর করে দোলায় দোল দিয়ে যায়।

ফুলের মালায় সাজিয়ে দেওয়া মোটরখানা বৌবাজারের মোড়ের ওই বিজলীবাতীর সমাবেশে লেখা, "স্বাগতম্" বাড়ীটার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের বারান্দায় জমে উঠে তরুণীর ভীড়। শাঁখের পর বেজে উঠে শাঁখ—কুল-নারীদের হুলুধ্বনিকে চাপা দিয়ে। টোপর মাথায় নিশিথ—সাদর অভ্যর্থনায় ঢুকে পড়ে বাড়ীর মধ্যে।

শুভ লগ্ন বয়ে যাবার আগেই সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, "বর বড়—না কনে বড় ?" চারিদিকে কাপড় ঢাকা দিয়ে শ্রীমান্ নাপিত বাবাজী কত রকম বে-রকমের ছড়া বল্‌তে সুরু ক'রে। বর-বধুর মালা-বদলের কালে নিশিথ হেনার গলায় মালা দিতে গিয়ে মহা আশ্চর্য্যে বলে, "হেনা ! তুমি !!" হেনা নিশিথের গলার মালাটা বদল ক'রে লজ্জা-পাওয়া-চোখ দুটো নেয় নামিয়ে। মুখে তা'র ফুটে ওঠে বড় তৃপ্তির হাসি। সসীম অদূরে দাঁড়িয়ে সব দেখে। সাম্‌নের বারান্দায় সানাইটা একঘেয়ে বেজে চলে—

"এল হারান দিনের সেই চৈতি রাতি।
মালতী গন্ধে ভরা॥"

রূপ-কথা

কি দেখ্‌ছ তুমি অমন ক'রে আমার দিকে চেয়ে ?
ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির রেখা এঁকে কথা জিগগেস্‌ করে রূপকে।

পাল্‌টা জবাবে রূপ তার ঠোঁট দুটো উল্‌টে বলে, "ইস্‌ ! ভারী ত' রূপ ! তাই আবার বারে বারে উনি তার পরখ করিয়ে নিতে চান আমারই মুখের কথা দিয়ে ! আমি যেন ওনার ওই রূপের পূজারী !"

কথা হঠাৎ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে বলে, "বেশ গো ঠাকুর বেশ ! আমি না হয় খুব কুৎসিতই হলাম। তাই বলে তোমার ওই টানা টানা চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর ফরসা নাদুস-নুদুস বপু আছে বলে তুমিও মনে কোরনা যে তোমার রূপটাও এমন কিছু অপরূপ।"

"তুমি যাই বল আর তাই বল কথা, তোমার চেয়ে কিন্তু আমার রূপ দেখতেই বল—আর শুনতেই বল, অনেক ভালো। আহা ! মরি মরি। কিবা রূপের ছিরি। ওই চোখে আবার সুরমা পরা হয়েছে !"

"বেশ করেছি যাও। নিজেকেও যেন খুব ভাল দেখাচ্ছে !

আহা-হা! কিবা তোমার পছন্দ! বাবুর আবার বড়ুয়া-কলার না হ'লে জামা-ই পছন্দ হয় না! রূপ নয়ত', যেন অপরূপ!"

"দেখ কথা—এখন চুপ্ কর্ বল্ছি, নইলে ভাল হ'বে না।"

"ও! ভারি আমার বিচার-কর্ত্তা এলেন গো! আমার ভাল হবেনা—আর যত ভাল হ'বে শুধু ওনার একরই!"

কথা আর হাসি চাপ্তে পারে না, খিল্ খিল্ ক'রে ওঠে হেসে। হাসির ধাক্কায় তার নিটোল গালে ছোট ছোট দুটো টোল খেয়ে যায়—কথার রূপ যায় আরও দ্বিগুণ বেড়ে। তাই রূপ একদৃষ্টে থাকে চেয়ে। সে চাহনীর উহ্য-তত্ত্বটুকু কথার মনের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই সে আবার গম্ভীর হয়ে বলে, "যাও রূপ! তুমি বড় দুষ্টু!"

রূপ ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে, "আমি তোমায় ভালবাসি কথা।"

মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে কথা উত্তর দেয়, "ও কথা ত' বহুবার শুনেছি রূপ! বারে বারে একই কথার ব্যবহারে যে তার ওজন কমে যায় তাও কি তুমি জাননা? তাছাড়া, ভালবেসে তাকে আপন পাশে পাওয়ার চেয়ে তার বিরহই ত' বেশী সুখের। কারণ, পাওয়ার মাঝে আছে শুধু খরচ হয়ে যাওয়ার কাজটুকু—যা জীবন মাঝে বয়ে আনে অনুশোচনার রাশি। তার চেয়ে ভালবেসে থা'কব দূরে, কত নিশিদিন দোঁহার কেটে যাবে দোঁহার চিন্তায়, মিলনের অদম্য স্পৃহা

করে তুলবে পাগল, পাখীর গানে শুনতে পাব দোঁহার মুখের কথা, প্রতিপদের চাঁদের দিকে তাকিয়ে শুধু পড়বে মনে তোমার আমার মুখখানা। এই ত' সুখের—এই ত' আনন্দের—এই ত' উপভোগের! চির-হাহাকারে ভরা সংসারের নিবিড় বন্ধনে নিজেকে আটকে ফেলাইত' চরম স্বার্থকতা নয় রূপ।"

কথার মাঝে আঘাত হেনে রূপ বলে, 'মাটীর দেশের মানুষ আমরা। চিরদিন মানুষ যা ক'রে এসেছে, তা থেকে আমাদের জীবন ধারা ত' ভিন্ন নয় কথা! তা'ছাড়া, তুমি যে কথাগুলো বলে চলেছ—সে কথাগুলো কেবল তাঁদেরই মুখে শোভা পায়, বাস্তবিকই যাঁরা কবি—ভাবুক! সত্যি যাঁরা রূপের সাধক, সত্যি যাঁরা ভোগের উপাসক, তুমি কি বল্‌তে চাও কথা, সে রূপ উপভোগ ক'রবার প্রবল স্পৃহা তাঁ'দের মনে জাগাটা একেবারে অসঙ্গত?"

কথা বলে, "না গো মশাই না। অসঙ্গত কেন হতে যাবে। আমার কথা তুমি মোটেই বুঝ্‌তে পারনি দেখ্‌ছি। বুঝিয়ে বল্‌ছি শোন। আচ্ছা, আগে ওই চাঁদের আলোয় ভরে যাওয়া, ফুলের গন্ধে মেতে ওঠা, পাগল-করা ফাগুন-হাওয়ায় বাগানটায় গিয়ে দু'জনে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসি চল। তারপর চল্‌বে মোদের কোন্ বিরহীর মিলন লাগি কাহার পাগল পারার কথা।"

কথাকটা এক নিশ্বাসে শেষ ক'রে, কথা রূপের হাত দু'টো ধ'রে প্রায় একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেল।

জ্যোৎস্নায় ফেটে পড়া রাত। ঝির-ঝির ক'রে বয়ে চলেছে

ফাগুন রাতের হাওয়া। রূপ আর কথা, দু'জনে সামনা সামনি হ'য়ে পড়ে' ব'সে। কথা বলে, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম—"

রূপ কথাকে বাধা দিয়ে বলে, "না ওকথা আর নয়।" তারপর কথার হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে বলে, "একটা গান গাওনা কথা?"

রূপের কথায়, কথা খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলে, "তুমি হাসালে রূপ—তুমি হাসালে। গান গাইব আমি?" তারপর হঠাৎ কি যেন কি ভেবে, হাসির বেগটা সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে আবার বলে, "না রূপ! কথাটা আমি Withdraw কর্‌ছি। কারণ, শ্রোতার ওজন হিসেব ক'রে যা দেখলাম, তাতে মনে হয়, আমি হেন গায়িকার গান, আসর গুণে মোটেই অচল হ'বে না। শোন তবে, রবীন্দ্রনাথেরই একখানা গান আমি গাই।"

রূপ মহানন্দে সম্মতি জানায়—কথা গান সুরু করে—

"যখন প'ড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।"

গান শেষ হয় না। রূপ আস্তে আস্তে উঠে পাতাবাহারের গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তা' দেখে কথা গান বন্ধ ক'রে মুখ টিপে একটু হাসে! তারপর গাম্ভীর্য্য এনে, মহা আশ্চর্য্যের ভণিতা করে রূপের পাশে গিয়ে মিহি সুরে জিগগেস্ করে, "কি হল রূপ?"

রূপ ওকথার কোন জবাব দেয় না। মুখের ওপর ফুটে ওঠে দারুণ অভিমানের ছাপ্। তাই আবার খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পিছু ফিরে দাঁড়ায় ওই শিউলী গাছের তলায়। কথা

আবার একটু হেসে বলে, "গানটা কি তোমার ভাল লাগ্‌ল না রূপ ?"

তার উত্তরে অভিমান-ভরা গলায় রূপ বলে, "মাপ্‌ কর কথা। আর কোনদিন কোন কথা তোমায় আমি বল্‌ব না। যেখানে আমার সবচেয়ে বেশী দুর্ব্বলতা সেইখানেতেই তুমি হেনে বস' প্রচণ্ড আঘাত। মিলনের পরিপূর্ণতাই যার জীবনের সবকিছু উপাদান, তার মূলে কেবলই তুমি ছড়িয়ে বেড়াও বিরহের উগ্রতম বিষ।"

কথা বলে, "আচ্ছা, তুমি কি চাও বলত' রূপ ?"

কথার আগ্রহে রূপ আনন্দে অধীর হয়ে বলে, "শুনবে—শুনবে কথা আমার মুখের ভাষা ? আচ্ছা শোন তবে বলি।"

দু'জনে শিউলি তলায় ব'সে পড়ে। রূপ সুরু করে, "আমি কি চাই জান ? আমি চাই একান্ত আপন ভাবে পেতে তোমাকে। তোমাকে নিয়েই গড়ে উঠবে আমার ছোট্ট সংসার, তোমারই নিপুন হাতের পরশ পেয়ে চিরসৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে সংসারের যত ছোট বড় সামগ্রীগুলো। কত নিশিদিন শুধু কেটে যাবে মোদের কত নিত্যি-নূতন গবেষণায়—দিনের সূর্য্যি আর রাতের চাঁদ হ'বে তার সাক্ষী। তা' দেখে আনন্দে অধীর বনের পাখী গাইবে গান, চঞ্চল বাতাস ক'রবে কানাকানি।"

"কিন্তু দু'জনের ভাবের গতি যেখানে পৃথক, তোমার মনের আশাত' পূর্ণ হ'তে পারে না রূপ ! আমি চাই কবির মনের ভাবটুকু আপন মনে বেঁধে, বিরহের মাঝে মিলনের স্মৃতি নিয়ে

বেঁচে থা'কতে। বিরহ-যাতনা মনের দেহকে করে তুলবে চঞ্চল, কিন্তু মিলন পরশে তা' উঠবে বিষিয়ে। একই গৃহে দুজনের হবে বাস, কিন্তু ব্যবধান থাক্‌বে একখানা ইটের পাঁচিল। জানালার ফাঁক দিয়ে কত কথাই না আমাদের হবে। চুপিসারে মনের মাঝে ছুটে চলবে আনন্দের লহরী। হাতে হাতে পরশ পেয়ে দেহে দেবে কাঁটা। দিনের শেষে ধার্য্য হ'বে শুভ বিবাহের দিনটা। হাসি-ভরা মুখ নিয়ে দু'জনেই পড়্‌ব ঘুমিয়ে, স্বপন মাঝে চল্‌বে মোদের ওই শুভদিনেরই যত কিছু আয়োজন। সূর্য্যি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভু'লব মোরা অতীত দিনের কথা। নতুন দিনের শুভাগমনে আবার মোদের সুরু হ'বে পুতুল খেলার পালা।"

কথার উত্তরে রূপ বিমর্ষ হ'য়ে প'ড়ে। তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে বুক থেকে একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে বাতাসে যায় মিলিয়ে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু—জ্যোৎস্নার আলোকে তা' উঠে ঝিক্‌মিকিয়ে।

তা' দেখে কথার প্রাণে লাগে প্রচণ্ড আঘাত। তাই সে নিজের মনের অসংযত ভাবটা চেপে রাখতে গিয়ে রূপের হাত-দুটো নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে হঠাৎ কান্না-পাওয়া গলায় বলে বসে, "অন্য কাউকে বিয়ে করে তুমি সুখী হও রূপ। তোমার প্রেমের উৎসকে অকারণে শুকিয়ে যেতে তুমি দিওনা।" টপ্‌ টপ্‌ ক'রে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তার চোখ হ'তে। কথা আর ব'লতে পারে না। কান্নায় তার কণ্ঠ রোধ

হয়ে আসে। রূপ অবাকদৃষ্টে খানিক চেয়ে থাকে কথার মুখের পানে। তারপর বলে, "তোমায় ছাড়া জীবনে আর কাউকে বিয়ে না করাই যে আমার জীবনের সঙ্কল্প কথা।"

প্রত্যুত্তরে কথা বলে, "তা'হলে জীবনে কেউই ত' সুখী হ'তে পা'রব না রূপ! দোঁহার প্রাণের সাধনা গুমরে কেঁদে মর্‌বে সমস্ত জীবনটা ধ'রে! আর তারই চোখের জলের পিছল পথে কেবলই আমরা পড়ব পিছ্‌লে। জীবন পথে চল্‌তে গিয়ে প্রতি পদেই লুটিয়ে প'ড়ব ধরার বুকে। সেই পড়ে যাওয়ার ব্যাথার লাঘব কেউই ত' কারুর ক'রতে পারব না রূপ!"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না রূপ। তাই সে শুধু চেয়ে থাকে অপলক্ দৃষ্টে—নিঃশব্দে ধারায় ধারায় শুধু বয়ে চলে মানুষের শেষের সম্বল ওই উত্তপ্ত অশ্রু।

কথা ব্যথা পায়। বিরহ-বেদনায় বুকখানা ওঠে ভরে! তার আঁচলের খুঁট্‌টা দিয়ে মুছিয়ে দেয় রূপের চোখ দুটো।

রাতের শেষে পাখী ওঠে ডেকে। পূব আকাশে পাকের রঙ্‌ ধরে—দু'জনে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

এমনিভাবে দু'য়ের মাঝে কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য যায় কেটে। রূপ আর কথার মাঝে রোজই চল্‌তে থাকে ওই একঘেয়ে আলোচনা। মিলনের আশে রোজই রূপের আনা-গোনা। সারাদিনের বিরহে কথার মনে বইতে থাকে মিলন আকাঙ্ক্ষার গভীরতম উৎস। তাই সকলের কাছে জিনিষটা যতই পুরোনো হ'ক—রূপ-কথার কাছে কিন্তু চির নতুনে ভরা।

তাই তাদের এতেও এত সুখ—এত শান্তি—এত আনন্দ! তাই এরা জীবনে কোনদিনই পেল না সংসারের অভাব অনটনের যাতনা, পুত্র শোকের নিদারুণ আঘাত, কন্যাদায়ের লাঞ্ছনা। আশা-নিরাশার মাঝে দু'জনে দু'জনের শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেই কাটিয়ে গেল তাদের সারা জীবনটা—প্রজাপতির নিয়ম লঙ্ঘন করে। রূপ আর কথাকে নিয়ে কত কত রূপ-কথার সৃষ্টি করলে এই মাটীর দেশের মানুষগুলো।

প্রত্যহ—রবিবাসরীয়—৩১শে বৈশাখ—১৩৫১

সুবিধাবাদী-সংবাদ

"গুড্ মর্ণিং স্যার্!" ইংরাজি কায়দায় শুভ প্রভাত জানিয়ে শুভেন্দু এসে যোগ দিল বন্ধু-বৈঠকে।

"গুড্ মর্ণিং—গুড্ মর্ণিং! তা দীর্ঘ দু'বছর পরে কি শুভ-বার্ত্তা নিয়ে হাজির হলেন শুভেন্দু বাবু? আপনার ফিল্ম কোম্পানীর খবর কি? সেন মশায়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে দিয়ে কোথায় ব'সে ছিলেন এতদিন? মনে মনে যাই ভাবুন, অর্থাৎ চটুন্ আর ফাটুন্, সত্যি কথা কটু হলেও তা' বল্‌তে আমি, অর্থাৎ এই যতীন কোনদিনই পিছ-পা' নয়।"

"আচ্ছা গুড্ মর্ণিং কথাটা আমার ধাতে সয় না কেন বলুন ত'! যেখানেই গুড্ মর্ণিং বলে হাজির হয়েছি, সেখান থেকেই কেউ না কেউ আপনারই মতো দশটা কথা না শুনিয়ে ছাড়েনি। আচ্ছা এবার তাহলে গুড্ নাইট বলে' বিদায় নি।"

"বিদায় ত' নেবেনই! কিন্তু তার আগে বলুন ত' শুভেন্দু বাবু! পরের টাকা মেরে জোচ্চোর হয়ে ওই টাই আর স্যুট্ পরা খুদে নবাবটী সেজে টারকিস্ হ্যাট পরা মাথাটা উঁচু ক'রে কেমন ক'রে নির্ব্বিবাদে ঘুরে বেড়ান আপনি? আপনার একবারও কি মনে হয়না যে, কতখানি কলঙ্কের ছাপ মাখানো রয়েছে আপনার ওই প্রতিটি অঙ্গে!"

"দেখুন যতীন বাবু! সোজাসুজি শুধু একটা কথাই বুঝি, সেটা হচ্ছে Necessity has no law—that means প্রয়োজন বলে জিনিষটা যখন অভাবের অভিযোগ মানে না, তখন সে প্রয়োজনটাকে ত' এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রোগে পড়ে ঔষুধ গেলার মতই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই পরের জিনিষ মাথায় ক'রে নিতে বাধ্য হ'তে হয়। তা'ছাড়া—"

"তা'ছাড়া ?"

"তাছাড়া একটুখানি আধ্যাত্মিকভাবে ভেবে দেখুন স্যার্ —এ দুনিয়ায় বাড়ী, গাড়ী আর ব্যাঙ্কের টাকা সকলেরই আছে। তবে কৃতকর্ম্মের ফলে নিজ সম্পত্তি পরের অধিকারে বলা যেতে পারে। তা'হলে ভেবে দেখুন স্যার্—বাহু অথবা বুদ্ধি বলে' যদি কেউ নিজের জিনিষ নিজের হাতেই আবার ফিরিয়ে আন্‌তে পারে তা'তে গৌরব ছাড়া কলঙ্কের বিষয়ই বা কি থাক্‌তে পারে আর লজ্জাই বা কিসের জন্যে? দেশ-বিদেশের ধন-সম্পত্তি লুট করে, লাখ লাখ লোকের প্রাণনাশ করে' দিগ্বিজয়ে গৌরব আছে, আর যত কলঙ্ক কি শুধু—"

"থাক্ শুভেন্দু বাবু। আপনার যুক্তি অকাট্য। প্রতিবাদ যখন কর্‌ছি না তখন আর বৃথা লেক্‌চারে প্রয়োজন নেই! হ্যাঁ ভাল কথা—"

"ও! এবার বুঝি আমার জেল খাটার কাহিনীটা শুন্‌তে চান্। তা মশাই বেশ কিছুদিন কেটেছিল আপনাদের ওই জেল নামক জায়গাটার মধ্যে! দিব্বি খেতাম্-দেতাম্ কাজ

কর্ম্ম ক'রতাম্ স্যার্। ছোটবেলা থেকে ব্যায়াম তো কোনদিন করিনি—তাই ওখানে গিয়ে পাথর-ভাঙ্গা ঘানিটানা ও ছুটো কাজই আমার শরীরে সাল্‌সার্ কাজ করেছে বল্‌তে হ'বে। হাজার হোক্ বেইমান ত' নই—স্বীকার করতে আপত্তি নেই। জেলের মধ্যে সারাদিনের পর সন্ধ্যে-বেলাকার সেই গাঁজার মজলিসটার কথা মনে প'ড়লে আজও দুঃখ হয় স্যার।"

"আপনি ত' মশাই বড় সাংঘাতিক লোক! নিজের কুৎসা নিজে গাইছেন অথচ এতটুকু সংকোচ নেই।"

"আপনারা আমায় যতই খারাপ ভাবুন স্যার আসলে কিন্তু আমি একটুও খারাপ নই। কারণ, আমার মত লোকের সংখ্যা জগতে যতই বাড়তে থাকবে, দুঃখ কষ্ট বলে জিনিষটা ততই কমতে থাক্‌বে এই দুনিয়ায়। কারণ, প্রয়োজনীয় জিনিষটা চাইলে যদি না দেয় কেউ, প্রয়োজন মেটাতে হ'লে বাধ্য হয়ে তা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবেই। কারণ, সকলেই যখন একই দেবতার আশ্রিত, তখন শ্রীভগবান নিশ্চয়ই আপনার আমার খাবারে তফাৎ করেন নি। আর সে পার্থক্য যখন আমাদেরই দ্বারা ঘটানো সম্ভব হ'য়েছে, তখন দরকার হ'লে সে পার্থক্যের উচ্ছেদও ক'রতে হ'বে আমাদেরই। সুতরাং, হয় আপনি চারতলা থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে ফুটপাতে দাঁড়ান, আর না হয় আমারাই সোজা আপনার চার-তলায় উঠে গিয়ে আপনার পাশেই ঠাঁই করে নেব। এতে কলঙ্ক, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতির কোন বালাই থাকতে পারে না।

শুধু ওই কারণেই সেন মশায়ের পঞ্চাশ হাজারের হিসেবটা এখন আমারই তাদারকে। তা'ছাড়া নিজের জিনিষ নিজে যে রক্ষে করতে পারে না, সেই কেবল চীৎকার ক'রে মরে চিট্ ক'রে নিল বলে। এ হচ্ছে সেই passive sword এরই মত—খুন্ আমি করিনি, খুন্ করেছে আমার এই তলোয়ারখানা! চমৎকার যুক্তি। আমি ঠকিনি—আমাকে ঠকিয়েছে সে। এ বিষয়ে অপরাধী হ'ল সে—যে ঠকিয়েছে। বস্তুতঃ অপরাধ তারই হওয়া উচিত—যার নিজেকে বাঁচাবার মত বল-বুদ্ধি-ভরসা কিছুই নেই।"

"আপনি ত' দেখছি মনেপ্রাণে কমিউনিষ্ট।"

"না যতীর বাবু! আমি কোন দলভুক্তই নই। আমি স্রেফ্ নিজস্ববাদী। নিজের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ছাড়া কিছুই বুঝিনা, বুঝতে চাইও না। তবে নিজের বিদ্যে-বুদ্ধিভরা মগজ-টাকে খাটিয়ে খাই—এই যা।"

"আচ্ছা শুভেন্দু বাবু! আজকাল কোল্‌কাতার এই অবস্থাটাকে কোন কাজে লাগাচ্ছেন্ না কেন?"

"কাজে লাগাচ্ছি বৈকি!"

"কি রকম—কি রকম?"

"সে অনেক রকম। যথা—একজনের কাছে সেলামীর টাকা নিয়ে জায়গা কেনা—দ্বিতীয়জনের সেলামীর টাকায় সেখানে বাড়ী তোলা, আর তৃতীয়জনের কাছে সেলামী নিয়ে তা'কেই বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া—এই হ'ল প্রথম রকম। দ্বিতীয়

হ'চ্ছে—একখানা ঘরে ছেঁড়া চটের আড়াল দিয়ে তাকে দু'খানা করা, আর সেই দু'খানাকে বাস্তুহারাদের ডবল টাকায় ভাড়া দেওয়া। আর তৃতীয়—তৃতীয় হচ্ছে—সাদা বাজারে কাপড় কিনে কালবাজারে বিক্রি করা, আর সেই লাভের পয়সায় কোল্‌কাতা সহরে আর একখানা বাড়ী ক'রবার প্ল্যান্ আঁকা, এবং তা'কে সর্ব্বতোভাবে বাস্তবে পরিণত করা। তারপর—"

"তারপর ?"

"তারপর হিন্দুস্থান পাকিস্থানের বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে যখন যেমন, তখন তেমন সুযোগ নেওয়া। অর্থাৎ এদের কাছে ওদের সাফাই আর ওদের কাছে এদের সাফাই গেয়ে পরস্পরকে বিষিয়ে তুলে নিজের কার্য্য সিদ্ধি করা।"

"কিন্তু এদের কাছে ওদের সাফাই গেয়ে বিশেষ কিছু লাভ হয় ব'লে আমার মনে হয় না শুভেন্দু বাবু!"

"কি যে বলেন আপনি স্যার্! লাভ আবার হয় না! আর কিছু হ'ক না হ'ক সাফাই গাওয়া অভ্যেস্‌টাত' বেশ সরগত করা যায়।"

"হ্যাঁ তা' করা যায় বটে।"

"তবে! ওইটেই ত' সবচেয়ে বড় লাভ। আচ্ছা আজ তাহ'লে গুডনাইট্ স্যার।"

শুভেন্দুবাবু চলে গেলেন। যতীন আর সুরেন দুই বন্ধু এক দৃষ্টে চেয়ে রইল শুভেন্দুর চলে যাওয়া পথের পানে। তারপর সুরেনই প্রথম আরম্ভ করল—

"কাল্‌টা ঠিক এই রকমই চলেছে যতীন। সুযোগ যারা নেবার তারা সর্ব্বদা সব কিছু সুযোগের সন্ধানেই ঘুরছে—আর নিচ্ছেও বটে। নইলে এই সেদিনের কথাটাই একবার ভেবে দেখনা। এ হাসপাতালে জায়গা নেই, ও হাসপাতলে জায়গা নেই—যেখানে যায় সেখানেই জায়গা পায় না। শেষে এখান থেকে ওখান আর ওখান থেকে এখান আনাগোনা কর্‌তে কর্‌তে ট্যাক্সির মধ্যেই ভদ্রমহিলা সন্তান প্রসব করে ফেল্‌লেন! আর সেই সুযোগ নিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার্‌টা গাড়ী অপবিত্র হয়েছে বলে ভদ্রলোকের কাছে আটাশ টাকা আদায় করে' নিলে। ভদ্র-লোকের কাছে অত টাকা ছিল না। বেচারী নিরুপায় হ'য়ে প্রসূতির গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার্‌কে বিদায় করেন। যাঁর কাছে গহনা বন্ধক রাখা হ'ল তিনিও আবার সুযোগ নিলেন। ডবল সুদে টাকা ধার দিলেন আবার সঙ্গে সঙ্গে শাসিয়ে দিলেন সাত দিনের মধ্যে গয়না না ছাড়িয়ে নিলে সব কিছু তিনি বাজেয়াপ্ত কর্‌বেন বলে। বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন দু'হাত দু'পা-ওয়ালা কলিযুগের এই মানুষগুলো কিভাবে চারপা-ওয়ালা জানোয়ারে পরিণত হয়েছে' একবার ভেবে দেখ যতীন!"

ভগ্নদূত—২৯ এপ্রিল,—১৯৪৯

খাজা নাজিমউদ্দিন মুস্‌লিম্ হল এণ্ড লাইব্রেরী (পূর্ব্ব পাকিস্থান) দিনাজপুর হইতে মহম্মদ হেমায়েৎ আলী কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত মাসিক "নও-বোজ" (১০ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) বলেন :—

"শান্তির বিয়ে"

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদাব প্রণীত।

"ভগ্নদূত, মাসিক নও-বোজ, দৈনিক প্রত্যহ, প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত মোট নয়টি গল্পের সংকোলন। তন্মধ্যে "পরাজয়", "আভা", "একটা সর্ট", "নয় অভিনয়", "নিশিগ-হেনা" এই পাঁচটী গল্পই মাসিক নও-বোজে প্রকাশিত। প্রত্যেকটী গল্পই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচিত। ইতিপূর্ব্বেই ইহা পাঠকের মনে দোলা দিয়েছে। সব কয়টী গল্প পুস্তকাকারে একত্রে পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

বিশ্বনাথ বাবুর অবচেতন মন ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেই গল্পেব প্রেরণা খুঁজে পান। এ গ্রন্থ তাহারই প্রতীক। "আভা", "নয় অভিনয়" গল্প দু'টী বাববাব পডতে ইচ্ছা করে। বচনা ভঙ্গী সরস বলেই মনে হ'ল। গ্রন্থখানি গল্পানুরাগীদেব উপভোগ্য হয়েছে। ইহাব বহুল প্রচার কামনা কবি।"

—আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ